কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :
শুভ নববর্ষ, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ :
অরুণ দাস

মুদ্রক :
শ্রীঃ কৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

স্নেহের
সুনন্দ বাগচী-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

ভয়ঙ্কর সুন্দর
সত্যি রাজপুত্র
তিন নম্বর চোখ
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি
সবুজ দ্বীপের রাজা
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
ডুংগা
পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক
জলদস্যু
আঁধার রাতের অতিথি
খালি জাহাজের রহস্য
মিশর রহস্য
কলকাতার জঙ্গলে

॥ ১ ॥

দিপু তার দুই বন্ধুর সঙ্গে ছাদে একটা ক্যাম্বিসের বল নিয়ে মিনি-ক্রিকেট খেলছিল, এমন সময় তার দাদা অমিত এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। দাদার মুখখানা গম্ভীর, খুব যেন চিন্তিত। দাদা ওদের খেলার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হাতছানি দিয়ে দিপুকে ডাকলো।

দিপু চট্ করে একবার তাকাল আকাশের দিকে। এখনো তো সূর্য অস্ত যায়নি। মা নিয়ম করে দিয়েছেন যে, যখন অন্ধকার হয়ে আসবে, আকাশে আর কোনো ঘুড়ি কিংবা পাখি দেখা যাবে না, তখন খেলা শেষ করে দিপুকে নীচে নেমে গিয়ে পড়তে বসতে হবে। তা হলে দাদা এক্ষুনি ডাকছে কেন? দিপুরা তো খেলার সময় বেশি দুম্‌দাম শব্দও করেনি!

মাত্র তিনজনের ক্রিকেট খেলায় একজন ব্যাটসম্যান, একজন বোলার আর একজন ফিল্‌ডার। উইকেটটা যে-হেতু দেয়ালের গায়ে আঁকা, তাই উইকেটকিপারের দরকার নেই। যে ফিলডার, সে-ই আমপায়ার।

দিপু ফিলডিং করছিল, সে দুই বন্ধুকে খেলা একটু বন্ধ রাখতে বলে এগিয়ে এল দাদার কাছে।

অমিতের বয়েস বেশি নয়। সে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। সে দিপুর জ্যাঠতুতো দাদা। আগে থাকত বর্ধমানে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য এখন কলকাতায় দিপুদের বাড়িতে থাকে।

দিপু জিজ্ঞেস করল, “কী বলছ?”

অমিত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল দিপুর মুখের দিকে। তারপর

বলল, "আচ্ছা, এখন নয়। তুই তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে আয়। তারপর তোর সঙ্গে কথা আছে।"

দিপু ফিরে এল খেলায়। সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দাদা কী বলতে এসেছিল ? দিপুর বাবার ক'দিন ধরে খুব অসুখ। আজ অবশ্য বাবা একটু ভাল আছেন। ইস্কুল থেকে ফিরে দিপু দেখেছে যে, বাবা ঘুমোচ্ছেন।

দিপু বোলিং করতে গিয়ে প্রথম ওভারের শেষ বলেই আউট করে দিল বাবলুকে। এবার তার ব্যাটিং করার পালা। কিন্তু দিপু বলল, "আমি আজ আর খেলব না রে ! দাদা আমাকে তাড়াতাড়ি নীচে যেতে বলল ! তোরা দু'জনে খেলবি ?"

বাব্‌লু আর ডন্‌ বলল, "আমরাও বাড়ি যাই। আজ টিভিতে কুইজ কমপিটিশন আছে।"

বন্ধুরা চলে যাবার পর দিপু নীচে এসে প্রথমে বাথরুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে নিতে লাগল।

বাথরুমের একটা দেয়ালে একটা বইয়ের র‍্যাক আছে। দিপুদের বাড়িতে এত বই যে, রাখবার জায়গাই কুলোয় না, তাই বাথরুমেও বই রাখতে হয়। দিপু দেখতে পেল সেই বইয়ের র‍্যাকে একটা প্রজাপতি এসে বসে আছে। দিপু দারুণ অবাক হয়ে গেল।

বাথরুমে একটা প্রজাপতি বসা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু দিপুর চমকে ওঠার কারণ আছে। দিপু নিজেই কালকে নিজের হাতে ঐ র‍্যাকে একটা বই রেখেছে, সেই বইটার নাম 'মথ্‌স অ্যাণ্ড বাটারফ্লাইজ।' সেই বইতে অবিকল ঐরকম হলদে-কালো ছিট-ছিট ডানার প্রজাপতির ছবি আছে। কী করে এরকম হয় ?

দিপু জানে, এই বাথরুমে একটা কেঁদো টিকটিকি আছে। তার দিদি ঐ টিকটিকিটাকে দেখলেই ভয় পায়। টিকটিকিটাকে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো ফাঁকফোঁকরে ঘাপটি মেরে বসে প্রজাপতিটার ওপর লক্ষ রাখছে। প্রজাপতিটার নড়াচড়ার কোনো লক্ষণই নেই। এমন সুন্দর একটা প্রজাপতি টিকটিকির পেটে

যাবে ?

অনেক সময় প্রজাপতির ডানা খপ করে ধরে ফেলা যায় । কিন্তু দিপু জানে, সেরকম করে ধরলে ওদের ডানার ক্ষতি হয়, আর ভাল করে উড়তে পারে না । সেইজন্য দিপু কাছে এসে প্রজাপতিটার গায়ে ফুঁ দিতে লাগল ।

দুই তিনবার বেশ জোরে ফুঁ দিতেই প্রজাপতিটা ফরফর করে উড়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল । এবারে দিপুর আর-একবার অবাক হবার পালা । প্রজাপতিটা ঠিক 'মথ্‌স অ্যাণ্ড বাটারফ্লাইজ' বইটার ওপরেই বসেছিল । এ যে অদ্ভুত ব্যাপার ! এমন কি হতে পারে যে, বইতে যে প্রজাপতির ছবিটা আছে, সেটাই জ্যান্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ? বইটা খুলে এক্ষুনি সেটা দেখা দরকার ।

দিপু বইটার দিকে হাত বাড়াতেই তার মা ডাকলেন, "দিপু ! দিপু ! শিগগির শোন !"

বইটা দেখা হল না, দিপু দরজা খুলে বেরিয়ে এল । মা বলল, "দিপু, চটিটা পরে একবার ডাক্তার-কাকামণির কাছে যা তো ! বলবি যে, বাবা হঠাৎ কেমন ছটফট করছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উনি চান একবার চলে আসেন ।"

দিপু ছুটে যেতে যেতে দেখল, বাবার ঘরে বিছানার পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দাদা কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে ।

মোড়ের মাথাতেই ডাক্তার-কাকামণির চেম্বার । উনি বাবার বন্ধু । কয়েকদিন আগে বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে মিনিবাস থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন । ভাগ্যিস বাড়ির কাছেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল । লোকেরা ধরাধরি করে ডাক্তার-কাকামণির চেম্বারেই নিয়ে আসে বাবাকে । কেউ কেউ বলেছিল হাসপাতালে পাঠাবার কথা । কিন্তু ডাক্তার-কাকামণি বলেছিলেন, "না, তার দরকার নেই, আঘাত গুরুতর নয় ।"

দিপু এসে দেখল, ডাক্তার-কাকামণি চেম্বারে নেই । জরুরি কলে গেছেন । কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, ফেরার সময় হয়ে গেছে, এক্ষুনি

ফিরে আসবেন।

কম্পাউণ্ডারবাবুকে খবরটা দিয়ে দিপু ফিরে যেতে পারত, কিন্তু ভাবল, একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে ডাক্তার-কাকামণিকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে।

চেম্বারে দু'জন রোগী বসে আছে। একজন সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে, আর একজন বুড়োমতন লোক। দ্বিতীয় লোকটির দিকে দিপু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। লোকটিকে অবিকল তাদের ইস্কুলের দরওয়ানের মতন দেখতে। শুধু তফাত এই যে, তাদের দরওয়ানের বয়েস একটু কম। তা হলে কি এই লোকটি দরওয়ানের দাদা? এই বুড়ো ভদ্রলোকের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্য বেশ দামি, ধুতির ওপর একটা মুগার পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল পাতলা, হাতে একটা সোনালি রঙের ব্যাণ্ডওয়ালা ঘড়ি। তা হলেও দরওয়ানজির সঙ্গে এর মুখের এমন মিল যে, নিশ্চয়ই দু'জনের মধ্যে আত্মীয়তা আছে।

দিপুর খুব ইচ্ছে করল, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে, উনি তাদের ইস্কুলের দরওয়ানজিকে চেনেন কি-না! কিন্তু লজ্জায় মুখ খুলতে পারল না। ঠিক কী ভাবে যে কথাটা আরম্ভ করবে, সেটাই ঠিক করা মুশকিল। এরকম কত প্রশ্নই মনে আসে, উত্তরটা জানা হয় না।

বরং দিপু ইস্কুলের দরওয়ানজিকে জিজ্ঞেস করবে, তার কোনো দাদা আছে কি-না। সেটা সহজ। বাড়িতে গিয়ে "মথ্‌স অ্যাণ্ড বাটারফ্লাইজ" বইটাও খুলে দেখতে হবে, ঐ প্রজাপতির ছবিটা আছে কি-না!

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবার পর দিপুর যখন মনে হল এবারে বাড়িতে ফিরে খবরটা দেওয়া উচিত, ঠিক তক্ষুনি ডাক্তার-কাকামণির গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর, দিপু মহারাজ? গলা খুশখুশ করছে, টক-মিষ্টি লজেন্স চাই?"

দিপু কখনো নিজের থেকে চায় না। ডাক্তার-কাকামণির সঙ্গে

দেখা হলে তিনি নিজেই পকেট থেকে একরকম লজেন্স বার করে দেন, সেগুলো খেলে নাকি গলার আওয়াজ ভাল হয়।

দিপু বলল, "মা আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে বলেছে। বাবা ছটফট করছেন!"

ডাক্তার-কাকামণি ভুরু তুলে তাকালেন। তারপর আপন মনেই বললেন, "জ্বর কমে গেছে, সকালবেলাই দেখে এলাম...এখন আবার কী হল? চল্ তো—"

দারোয়ানজির দাদা ও অন্য রোগীটিকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ডাক্তার-কাকামণি আবার বেরিয়ে এলেন। এত কাছে দিপুদের বাড়ি বলে তিনি গাড়ি নিলেন না।

দিপুর কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে-হাঁটতে ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "মনে কর, দিপু, তোর নামে একটা লটারির টিকিট কেটে সেটা আমি তোকে দিয়ে দিলুম। তারপর সেই টিকিটেই তুই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেলি এক কোটি টাকা। তখন সেই টাকাটা নিয়ে তুই কী করবি?"

দিপু কিছুই বলল না।

ডাক্তার-কাকামণি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, চুপ করে রইলি কেন? বল!"

দিপু বলল, "ভাবছি! এক কোটি টাকা পেলে...একটা ভাল ক্রিকেট ব্যাট কিনব। একটা না, একজোড়া। আর দুটো ডিউস বল্!"

ডাক্তার-কাকামণি হাসতে হাসতে বললেন, "মোটে এই! এক কোটি টাকা মানে কত টাকা জানিস? আর কী করবি সেই টাকা দিয়ে?"

দিপু বলল, "আর...একটা খেলার মাঠ কিনব। আমাদের এ-পাড়ায় খেলার জায়গা নেই।"

"আর?"

"আর বই কিনব!"

"আরও তো অনেক টাকা থাকবে।"

"আরও অনেক কিছু কিনব, এখন মনে পড়ছে না !"

"তুই ব্যাটা কী পাজি রে ! সব টাকাটা মেরে দিবি ? আমি যে টিকিটটা কিনে দিলুম। আমায় কিছু দিবি না ?"

দিপু লজ্জা পেয়ে গেল। আসলে তার বলা উচিত ছিল, সব টাকাটাই সে ডাক্তার-কাকামণিকে দিয়ে দেবে।

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "তুই দিলেও আমি অবশ্য নেব না। এক কোটি টাকা তোকেই খরচ করতে হবে। পুরো টাকাটা তুই কী ভাবে খরচ করবি, তা আমি তোর কাছে শুনতে চাই। দু' দিন সময় দিলুম, তারপর আমায় বলে যাবি !"

দিপুদের ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলা। বাবার ঘরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। যেন তর্ক হচ্ছে বাবা আর মায়ের মধ্যে।

ডাক্তার-কাকামণি ঘরে ঢুকে বললেন, "আবার কী হল, অরুণ ?"

বাবা শুয়ে শুয়ে দু' পাশে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন চোখ বুজে। এবারে থেমে গিয়ে চোখ খুলে বললেন, "কে, প্রিয়তোষ ? তোমাকে কে ডেকে আনল ? আমি তো ভালই আছি !"

ডাক্তার-কাকামণি বিছানার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, "ভাল থাকবারই তো কথা। তা হলে আবার ছটফট করছো কেন ? তোমার ই· ই· জি· রিপোর্টে কোনো গণ্ডগোল নেই, জ্বরও সেরে গেছে। মাথায় ব্যথা করছে নাকি ?"

বাবা বললেন, "না, না, ব্যথা-ট্যথাও সেরকম নেই। আমি ভালই হয়ে গেছি। সেই কথাটাই ওরা বুঝছে না।"

মা ডাক্তার-কাকামণিকে বললেন, "দেখুন তো, কী পাগলামি করছে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে বর্ধমান যাবে !"

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "সে কী, বর্ধমান যাবে ? আমি তো আরও দশদিন অন্তত কমপ্লিট রেস্টে থাকতে বলছি।"

বাবা বললেন, "ধ্যাত ! আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি। হাঁটতেও পারি। ট্রেনে করে বর্ধমান যাব, তাতে অসুবিধে কী আছে ? আমি কি ছেলেমানুষ ? প্রিয়তোষ, তুমি ওদের একটু বলে দাও তো ?"

ডাক্তার-কাকামণি জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ এখন বর্ধমান যেতে হবে কেন ? এমন কী জরুরি ব্যাপার আছে সেখানে ?"

মা আর দাদা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন । কিছু বললেন না । বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি জানো তো, প্রিয়তোষ, বর্ধমানের এক গ্রামে আমার দাদা থাকেন । দাদা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাগান করায় মন দিয়েছেন, একাই থাকেন । বৌদি তো নেই । অনেকদিন দাদার কোনো খবর পাইনি । সেইজন্য আমার মনটা ছটফট করছে ।"

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "গ্রামে পোস্ট-অফিস আছে তো ? একটা চিঠি লেখ ।"

বাবা বললেন, "দু-তিনটে চিঠির কোনো উত্তর আসেনি ।"

মা বললেন, "ওঁর অ্যাকসিডেন্টের পর একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল ।"

বাবা বললেন, "যেদিন আমার অ্যাকসিডেন্ট হল, সেদিন তো প্রিয়তোষ তুমি একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে । ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখলুম যে, দাদারও একটা দুর্ঘটনা হয়েছে !"

ডাক্তার-কাকামণি সামান্য হেসে বললেন, "তোমার আর তোমার দাদার একইসঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হল ? শ্যামদেশের যমজদের এরকম হয় শুনেছি ! শোনো, অরুণ, স্বপ্নে সাধারণত লোকে উল্টো জিনিসই দেখে । তোমার দাদা ভালই আছেন নিশ্চয়ই !"

বাবা বললেন, "তা হলে চিঠির উত্তর নেই, টেলিগ্রামের উত্তর নেই কেন ? দাদা যে গ্রামে আছে, সেখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে পোস্ট-অফিস । কদিন ধরে আমি ঘুমোতেই পারছি না । চোখ তুললেই দেখতে পাই, দাদা যেন একটা পুকুরের ধারে শুয়ে আছে, কাছাকাছি আর কেউ নেই ! নাঃ, আমাকে একবার দাদার খোঁজ নিতে যেতেই হবে !"

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "তোমাকেই যেতে হবে কেন ? আর কেউ যেতে পারে না ? অমিত, তুমি ঘুরে এসো—"

মা বললেন, "অমিতের যে একটা পরীক্ষা চলছে। আরও তিনদিন বাকি আছে, ও কী করে যাবে ?"

অমিত বলল, "ঠিক আছে, আমিই কাল ঘুরে আসছি। একটা পরীক্ষা নষ্ট হবে, আর কী করা যাবে !"

বাবা বললেন, "না, না তা হয় না। অমিত এই পরীক্ষা না দিলে ওর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে !"

দিপু বলে উঠল, "আমি তো যেতে পারি। আমি যাব।"

ঘরের সবাই দিপুর দিকে তাকাল। দিপুর বয়েস এখন তেরো বছর, সে একা একা কখনো কোথাও যায়নি। একা সে স্কুলে যায় বটে, কিন্তু ট্রেনে সে একা যাবে ?

বাবা বললেন, "দিপু পারবে না ! মেমারি স্টেশনে নেমে বাসে করে যেতে হবে পাঁচ মাইল। তারপর কাঁচা রাস্তা, সাইকেল-ভ্যানে যেতে হয়।"

দিপুর দিদি ইরানির বয়েস সতেরো। সে মাঝে মাঝে ফ্রক পড়ে। দু' একদিন শাড়ি পরে। এখনো তার চুলে খোঁপা হয় না। কোনো বইতে দুঃখের গল্প থাকলেই পড়তে পড়তে সে কাঁদে। কেউ তাকে বেশি রাগালেও সে কেঁদে ফেলে।

ইরানি বলল, "দিপু আমার সঙ্গে চলুক না। আমরা দুজনে ঠিক যেতে পারব।"

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "থাক, তোর আর গিয়ে কাজ নেই। তুই বেড়াল দেখলে ভয় পাস !"

দিপু বলল, "দিদি টিকটিকি দেখলেও ভয় পায় !"

ইরানি বল, "ট্রেনে কি বেড়াল থাকে না টিকটিকি থাকে ? আমি তো কোনোদিন ট্রেনে ওসব দেখিনি।"

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "ট্রেনে চোর-ডাকাত থাকতে পারে।"

ইরানি বলল, "আমি চোর-ডাকাতদের ভয় পাই না !"

বাবা বললেন, "না, না, এসব ছেলেমানুষদের কাজ নয়। ধরো,

যদি দাদার সত্যিই কোনো বিপদ হয়ে থাকে, সেখানে ওরা গিয়ে কী করবে ?"

ডাক্তার-কাকামণি বললেন, "আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার কম্পাউণ্ডারবাবুর একটি বেকার ভাই আছে, ক'দিন থেকেই সে কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করছে আমার কাছে। সে যাবে এখন দিপুর সঙ্গে। ছোকরার গায়ে বেশ জোর আছে, বুদ্ধিও আছে। কাল সকালের ট্রেনেই চলে যাক ওরা দু'জন।

সবাই মেনে নিল সেই প্রস্তাব। দিপুর অবশ্য একলা যাবারই বেশি ইচ্ছে ছিল। তবু যাই হোক, বাড়ির বেশ একটা বড় কাজের দায়িত্ব নিয়েই তো সে যাচ্ছে !

দিপু আর অমিত এক ঘরেই শোয়। রাত্তিরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর অমিত বলল, "বিকেল থেকে এই কথাটাই তোকে বলব ভাবছিলুম, বুঝলি দিপু ! কাকা যেমন ছটফট করছেন, তাতে আমারও চিন্তা হচ্ছে। গ্রাম থেকে বাবার খবর আনা দরকার। কিন্তু আমি যদি এই পরীক্ষাটা না দিই, তা হলে আমার অন্তত তিনটে মাস নষ্ট হয়ে যাবে ! তুই ঠিক পারবি তো ?"

দিপু বলল, "কেন পারব না ? এমন কী শক্ত ব্যাপার !"

অমিত বলল, "তোর সঙ্গে আর একজন লোক গেলেও, সে তো কিছু চেনে না। তোকেই চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোর মনে আছে ?"

দিপু বলল,"মাত্তর দু'বছর আগেই তো গিয়েছিলুম। রাস্তা চেনা খুব ইজি। ট্রেন থেকে নেমেই বাস, তারপর সাইকেল-ভ্যান, দূর থেকে দেখেই আমি চিনতে পারব বাড়িটা। পাশাপাশি দুটো বশ বড় নারকোল গাছ আছে না ?"

অমিত বলল, "নারকোল গাছ না, তালগাছ। সে তো আমি ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দেব সব।"

এই সময় বাবার ঘর থেকে একটা চিৎকার শোনা যেতেই ওরা ছুটে গেল সেখানে। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যেই তিনি

মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলছেন, "দাদা, দাদা, তোমার কী হয়েছে ? তুমি পুকুর-ধারে শুয়ে আছ কেন ? দাদা, দাদা—"

বাবার দু' চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

মা বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "এই শোনো ! তুমি স্বপ্ন দেখছ ! দিপু তো কালই যাচ্ছে খবর আনতে ! তুমি চিন্তা কোরো না, ঘুমোও !"

বাবা চোখ মেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সবার দিকে। তারপর মাকে বললেন, "কী করি বলো তো ! চোখ বুজলেই আমি ঐ দৃশ্যটা দেখতে পাই ! নিশ্চয়ই দাদার কিছু হয়েছে !"

মা বললেন, "কাল তো দিপুকে পাঠানো হচ্ছে। কাল রাত্তিরের মধ্যেই ও খবর নিয়ে ফিরে আসবে !"

বাবা বললেন, "দিপু ছেলেমানুষ, অতদূরে যাবে...তুই পারবি, দিপু ?"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, বাবা, পারব, আমি জ্যাঠামণিকে সঙ্গে নিয়ে কালই ফিরে আসব !"

পরদিন সকালেই খবর পাওয়া গেল, কম্পাউণ্ডারবাবুর বেকার ভাইটিকে পাওয়া যাবে না। তার ধুমজ্বর, ম্যালেরিয়া হয়েছে।

॥ ২ ॥

অমিত ভোর-রাতে উঠে পড়তে বসেছে। দিপুও বেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁত-টাঁত মেজে স্টেশনে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় ঐ খবরটা এল।

অমিত হাতের বইটা ধপাস করে টেবিলের ওপর ফেলে বলল, "চুলোয় যাক পরীক্ষা ! চল দিপু, আমিই যাব তোর সঙ্গে।"

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে অমিত জামা পরতে শুরু করল। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। মুখে একটা কান্না-কান্না ভাব।

দিপু কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে যেতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারব।"

অমিত বলল, "নাঃ! আমারও মনটা ভাল লাগছে না। প্রায় এক মাস বাবার চিঠি পাইনি। এই পরীক্ষাটা না দিলে তিনটে মাস নষ্ট হবে, তাতে আর কী করা যাবে!"

দিপু বলল, "মনে করো তুমি বর্ধমানে গেলে, তারপর গিয়ে দেখলে যে, জ্যাঠামশাই ভাল আছেন, তখন তোমার কী মনে হবে? পরীক্ষাটা শুধু শুধু নষ্ট হবে!"

এই সময় মা ঘরে ঢুকে বললেন, "কম্পাউণ্ডারবাবুর ভাই তো এল না! তা হলে কে যাবে দিপুর সঙ্গে?"

অমিত বলল, "আমিই যাব ঠিক করেছি!"

মা বললেন, "তুই যাবি? পাগল নাকি? তুই মন দিয়ে পড়াশুনো কর্ তো! আমি দেখছি, আর কাকে দিপুর সঙ্গে পাঠানো যায়!"

অমিত বলল, "না, কাকিমা, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। আর কারুকে খুঁজতে হবে না।"

মা বললেন, "রঘুকে ভবানীপুরে পাঠাচ্ছি, পুতুলকে ডেকে আনবে, পুতুল যাবে দিপুকে নিয়ে। নাহয় পুতুলের একদিন-দু'দিন অফিস কামাই হবে!"

দিপু বলল, "ছোটমামা তো এই মাস থেকে দুর্গাপুরে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তোমার মনে নেই, মা?"

মা বললেন, "ও, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলুম।"

ইরানি কখন এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সে এবার বলল, "একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমরা এমন কাণ্ড করছ কেন বলো তো? আমি তো বলেইছি, আমি যাব জ্যাঠামশাইয়ের খবর আনতে। গত বছর আমি শান্তিনিকেতন গেলুম না? আমাকে একা যদি ছাড়তে না চাও, দিপু চলুক আমার সঙ্গে!"

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। মা কিছুতেই ইরানিকে যেতে দিতে চান না। ইরানি জেদ ধরেছে, সে যাবেই।

অমিত বলছে, কারুরই যাবার দরকার নেই, সে একা ঘুরে আসবে।

শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে যাওয়া হল। বাবা আজ সকালে বেশ ভালই আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, বাবা কিন্তু ইরানির যাওয়া সম্পর্কে কোনো আপত্তি জানালেন না। তিনি বললেন, "অমিতের পরীক্ষা নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। ইরানি আর দিপুই ঘুরে আসুক। আজকালকার মেয়েরা প্লেন চালাচ্ছে, রকেটে করে স্পেসে ঘুরে আসছে, আর ইরানি সামান্য বর্ধমান ঘুরে আসতে পারবে না ? শোন্, তোরা গিয়ে আজই ফেরার চেষ্টা করিস না। রাত্তিরটা ওখানেই থেকে যাবি। কাল সকালে আবার ট্রেনে চাপবি। ওখানে এককড়ি আছে, মধু-কেষ্ট আছে, থাকার কোনো অসুবিধে হবে না। আর যদি দেখিস দাদা সত্যিই খুব অসুস্থ, তা হলে দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আসবি। কিংবা যদি মনে করিস, দু' একদিন থেকে যাওয়া দরকার, তাও থেকে যেতে পারিস। আমাদের টেলিগ্রাম করে খবর দিবি।"

ইরানি সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাগে জামাকাপড় গুছিয়ে ফেলল। মা অবশ্য শুধু ইরানি আর দিপুকে ছাড়লেন না, সঙ্গে দিয়ে দিলেন রঘুকে। রঘুর বয়েস পনেরো, সে দিপুর থেকে খানিকটা বড় আর ইরানির থেকে একটু ছোট।

অমিত বুঝিয়ে দিল ট্রেন থেকে নেমে কোথায় বাস ধরতে হবে আর কোথায় নামতে হবে।

মা বলেছিলেন ট্যাক্সি নিতে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়েই ইরানি বলল, "বাজে পয়সা খরচ করবার কোনো মানে হয় না। আমরা মিনিবাসে যাব।"

সকাল সাড়ে আটটা বাজে। এর মধ্যেই অফিস-যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। ওরা লাইন দিয়ে মিনিবাসে উঠল।

হাওড়া স্টেশনে এসে ওরা প্রথমে একটু দিশাহারা হয়ে গেল। এত বড় স্টেশন, কোথায় টিকিট কাটার জায়গা ? যেখানে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটঘর, সেখানে অনেকগুলো কাউণ্টার। মেমারির টিকিট কোন্‌টা থেকে পাওয়া যাবে ? প্রত্যেক কাউণ্টারের মাথায় অনেক

জায়গার নাম লেখা। ইরানি আর দিপু সেই নামগুলোর মধ্যে মেমারি নামটা খুঁজতে লাগল।

রঘু বলল, "ও দিদিমণি, লোক্যাল টেরেনের টিকিট কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি। আমি তো বড়মামার সঙ্গে দেশে যাই। ঐদিকে তার টিকিট পাওয়া যায়।"

ইরানি বলল, "তোদের দেশ তো মেদিনীপুরে। আমরা কি সেদিকে যাচ্ছি নাকি! আমরা তো যাচ্ছি বর্ধমানের দিকে।"

দিপু বলল, "বর্ধমানে মোটেই লোক্যাল ট্রেন যায় না। বর্ধমান তো অনেক দূর।"

রঘু তবু জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, যায়। বধ্ধোমানে লোক্যাল টেরেন যায়!"

রঘু প্রায় ওদের জোর করেই নিয়ে গেল অন্য দিকে। দেখা গেল, রঘু ওদের চেয়ে অনেক কিছু বেশি জানে। সত্যি সেখানে মেমারির টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দুটো ট্রেন আছে। যে-কোনো একটাতেই যাওয়া যায়।

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে টিকিটের টাকা বার করতে গিয়ে ইরানি থমকে গেল।

পাশ ফিরে দিপুকে জিজ্ঞেস করল, "রঘুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো দরকার আছে? বাড়িতে মাকে একা-একা সব কাজ করতে হবে। রঘু আমাদের সঙ্গে গিয়েই বা কী সাহায্য করবে? রঘু বরং বাড়ি ফিরে যাক। তুই কী বলিস?"

দিপু মাথা নেড়ে দিদির কথায় সায় দিল।

রঘু কিন্তু বেঁকে বসল। সে ফিরে যাবে না। মা তাকে সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছেন, এখন সে একলা ফিরে গেলে মায়ের কাছে বকুনি খাবে।

ইরানির মুখে একটু বিরক্ত-বিরক্ত ভাব। রঘুর মতন একটা বাচ্চা ছেলেকে যে তাদের সঙ্গে পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে, সেটা তার পছন্দ হচ্ছে না।

অনেক বলেও রঘুকে বোঝানো গেল না। অগত্যা রঘুর টিকিট কাটতেই হল।

একটা ট্রেন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে, একটা ট্রেন সাত নম্বরে। সাত নম্বরেরটাই আগে ছাড়বে। ওরা গিয়ে দেখল, সেই ট্রেনে বেশ ভিড়, কোনো কামরাতেই জায়গা নেই, এর মধ্যেই লোকে দাঁড়িয়ে আছে।

রঘু বলল, "দিদিমণি, অন্য টেরেনটায় চলো! আমার বড়মামা বলেছে, পর পর দুটো টেরেন থাকলে পরেরটাতে যেতে হয়। বসবার জায়গা পাওয়া যায়।"

ইরানি বলল, "চল, দেখি গিয়ে।"

ওরা যেই ফিরতে যাচ্ছে, সেই সময় খাকি প্যান্ট ও হলদে গেঞ্জি পরা একটা লোক দিপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথায় যাবে ভাই?"

দিপু বলল, "মেমারি!"

লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলল, "তোমরা অন্য দিকে যাচ্ছ কেন? এই তো, এই ট্রেন মেমারিতে থামবে, উঠে পড়ো উঠে পড়ো!"

দিপু দিদির দিকে তাকাতেই ইরানি কঠোরভাবে বলল, "না, আমরা একটু পরে যাব!"

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ইরানি বলল, "আজেবাজে লোক কেউ কিছু বললে গ্রাহ্য করবি না দিপু। তুই ঐ লোকটাকে কেন বললি আমরা মেমারি যাচ্ছি?"

দিপু বলল, "কেন, বললে কী হয়েছে?"

ইরানি বলল, "যদি পাজি লোক হয়? যদি আমাদের ফলো করে? ঐ লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় ও পাজি লোক।"

দিপু বলল, "দেখলেই বোঝা যায়? আমি তো বুঝলুম না। তুমি কী করে বুঝলে?"

ইরানি বলল, "খাকি প্যান্টের সঙ্গে যারা হলদে গেঞ্জি পরে, তারা কখনো ভাল লোক হতে পারে না!"

দিপু ফিক করে হেসে ফেলল। সে জানে, তার দিদি পোশাকের

ব্যাপারে খুব পিটপিটে। আর যারা খুব বেশি পান খায়, তাদেরও দিদি দেখতে পারে না। ঐ খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটার দাঁতে লাল লাল ছোপ।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের গাড়িটাতেও বেশ ভিড়। এতেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

দিপু বলল, "তা হলে তো ঐ ট্রেনটাতেই আমরা গেলে পারতুম। আগে আগে পৌঁছে যেতুম!"

ইরানি বলল, "এটাতেও দাঁড়িয়ে যেতে হবে? কী বিচ্ছিরি! ট্রেনে জানলার ধারে না বসলে আমার একটুও ভাল লাগে না!"

দিপু বলল, "চলো দিদি, আমরা ঐ ট্রেনটাতেই যাই। এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?"

ইরানি বলল, "চল তা হলে!"

ওরা আবার যেই সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে, অমনি সেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

দিপু দৌড়ে সেদিকে যাবার চেষ্টা করতেই ইরানি তার হাত চেপে ধরে বলল, "নাঃ। ওরকম ভাবে চলন্ত ট্রেনে উঠতে নেই। আর একটা ট্রেন তো আছেই?"

রঘু বলল, "চলো দিদিমণি, যদি ওটাও হঠাৎ ছেড়ে দেয়।"

ওরা এবার জোরে পা চালাল, তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। হঠাৎ দিপু মুখ ফিরিয়ে দেখল ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সেই খাকি প্যাণ্ট আর হলদে গেঞ্জি পরা লোকটা।

॥ ৩ ॥

এই ট্রেনটায় বেশ ভিড়। মাঝামাঝি একটা কামরায় ঠেলেঠুলে উঠে পড়ল ওরা।

দিপুর ধারণা ছিল সকালবেলা বাইরে থেকে অনেক লোক

কলকাতায় আসে। কিন্তু কলকাতা থেকেও বাইরে এত লোক যায়? একটা ট্রেনের কামরায় কতরকম মানুষ থাকে, কার যে কী কাজ তা কে জানে!

বসবার জায়গা নেই, ওরা দাঁড়িয়েই আছে। রঘু ওরই মধ্যে এক জায়গায় চেপেচুপে বসে পড়ল, তারপর শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে আরও খানিকটা জায়গা করে নেবার পর ইরানিকে বলল, "দিদি, এসো না, এইখানে জায়গা আছে।"

ইরানি রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ট্রামে-বাসে বা ট্রেনে বসবার জন্য লোভ করা তার একদম পছন্দ হয় না। আরও লোক যদি দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তাহলে সেও নিশ্চয়ই পারবে।

খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটা ওদের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দিপু এক-একবার লোকটিকে আপাদমস্তক দেখছে আর ইরানির দিকে চোখ সরু করে তাকাচ্ছে। লোকটা পান চিবিয়ে চলেছে আপন মনে, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল। একটু বাদে সে একটা দেশলাই-কাঠি বার করে কান খোঁচাতে লাগল।

দুটো স্টেশন ছাড়িয়ে যেতেই কামরাটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। বসবার জায়গা পেয়ে গেল সবাই। রঘু একটা জানলার কাছে বসেছে। দিপুর পাশে বসেছেন এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক, কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটা। তিনি মাঝে-মাঝেই চোখ বুজে ফেলছেন। খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটি বসেছে উল্টো দিকের বেঞ্চে। মাঝে-মাঝেই দিপুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে আর দিপু চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এতক্ষণ ধরে লোকটিকে দেখবার পর দিপুর ধারণা হয়েছে, লোকটি ঠিক সাধারণ রেলযাত্রী নয়, কী যেন একটা মতলব ভাঁজছে মনে মনে। ইরানি ঠিকই আন্দাজ করেছিল। কামরায় এত লোক থাকতে ঐ লোকটি শুধু যেন দিপু আর ইরানির দিকেই নজর রাখছে সর্বক্ষণ। কী চায় ও?

উল্টো দিকের কোণের দিকে বসে আছে চার-পাঁচজন একবয়েসি যুবক, মনে হয় কলেজের ছাত্র, কিন্তু কারুর হাতেই বই-খাতা নেই।

চার-পাঁচজন কলেজের ছেলে একসঙ্গে থাকলেই সাধারণত চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলে, এরা কিন্তু একদম চুপচাপ। প্রত্যেকেই যেন খুব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

কামরাটিতে আর কয়েকজন লোক রয়েছে, তারা যে কে কী করে তা দিপু আন্দাজ করতে পারল না। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, সিনেমা-হলে সব সময় এইরকম কিছু সাদামাটা লোক থাকে।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক তাঁর খুব রোগা বউকে নিয়ে বসেছেন একপাশে। ওঁদের সঙ্গে চারটি ছেলে-মেয়ে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির বয়েস তিন-চার বছর, সে খুব দুরন্ত। সে বারবার দরজার কাছে চলে যাচ্ছে আর তার বাবা বকে উঠছেন, "অ্যাই! আবার, আবার! ওদিকে যাবিনি! যাবিনি বলছি। অ্যাই ঝিঙে, ওকে ধরে এনে গাঁট্টা মার তো!"

বড় একটি ছেলে গিয়ে তার ছোট ভাইকে ধরে আনছে। ঐ বড় ছেলেটির নাম ঝিঙে। ঐ নামটা দিপু যতবারই শুনছে ততবারই তার হাসি পাচ্ছে। ঐ ছেলেটার নাম ঝিঙে রাখা হয়েছে কেন? ও কি ঝিঙের মতন দেখতে, না ঝিঙে খেতে ভালবাসে?

খাকি-প্যাণ্ট হঠাৎ দিপুকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি মেইন লাইনের গাড়ি না কর্ড লাইনের?"

দিপু এই প্রশ্নটার মানেই বুঝতে পারল না। পাশ থেকে একজন বলল, "মেইন লাইন!"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "এ গাড়ি মেমারিতে থামবে?"

পাশের লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, "হুঁ!"

দিপু ইরানির দিকে তাকাল। এই লোকটাও মেমারিতে নামবে? অথবা লোকটা কি জেনে গেছে যে, দিপুদেরও ওখানেই নামবার কথা? কী করে জানল? এক হতে পারে, দিদি যখন টিকিট কাটছিল, তখন লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

লোকটি এবার দিপুকে জিজ্ঞেস করল, "কলকাতায় তোমরা কোথায় থাকো ভাই?"

উত্তর দেবার আগে দিপু দিদির দিকে তাকাল। ইরানির মুখে রাগ-রাগ ভাব। অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলা সে একদম পছন্দ করে না। ভুরু কাঁপিয়ে সে দিপুকে বুঝিয়ে দিল যে, কথা বলার দরকার নেই।

কিন্তু একটা লোক একটা কথা জিজ্ঞেস করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, এই অবস্থায় উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকা যায় কী করে?

কোনো রকমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে দিপু বলল, "লেকের কাছে!"

লোকটি বলল, "বালিগঞ্জ লেক? তার কোন্ দিকে?"

ট্রেনটা তখনই একটা স্টেশনে থামল। ইরানি অমনি বলল, "দিপু, বাদাম কিনে আন তো!"

দিপু উঠে চলে গেল দরজার দিকে। কিন্তু ট্রেনটা থামতে না থামতেই দু'জন লোক অনেক মালপত্র নিয়ে উঠতে লাগল কম্পার্টমেন্টে। পাঁচ-ছ'খানা কাপড়ের বোঁচকা। তার ফলে দিপু দরজার কাছে পৌঁছতেই পারল না, বাদাম কেনাও হল না, তার আগেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

খাকি-প্যান্ট পরা লোকটা এরই মধ্যে জানলা দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে এক ঠোঙা বাদাম কিনে ফেলেছে। চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ছুটে ছুটে দাম আদায় করে নিল বাদামওয়ালা।

লোকটি নিজের সিটে ফিরে এসে ঠোঙাটা দিপুদের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, "তুমি পারলে না তো? কায়দা জানতে হয়, বুঝলে? এই নাও!"

ইরানি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দিপুর খুব লজ্জা করতে লাগল। একজন লোক বাদাম খাওয়াতে চাইলে কি 'না' বলা যায়? অথচ অজানা-অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু খাওয়াও উচিত নয়।

দিপু বলল, "না, না, আপনি খান না!"

খাকি-প্যান্ট বলল, "আরে খাও না! তুমি তো বাদাম কিনতেই চেয়েছিলে!"

প্রায় জোর করেই লোকটি কিছু বাদাম ঢেলে দিল দিপুর কোলের ওপরে।

কামরার উল্টো দিকে খানিকটা জায়গা খালি ছিল, ইরানি উঠে গিয়ে সেখানে বসল। তারপর ডাকল, "দিপু, এদিকে চলে আয়!"

বাদামগুলো ফেলে চলে যাওয়া যায় না। দিপু সেগুলো মুঠো করে নিয়ে গেল।

ইরানি বলল, "খেতে হবে না, ওগুলো ফেলে দে!"

দিপু হাসল। দিদির বড্ড বেশি-বেশি রাগ। চিনেবাদামগুলো কী দোষ করেছে? খোসা ছাড়িয়ে চিনেবাদাম খেতে হয়, এতে তো আর কেউ বিষ মিশিয়ে দিতে পারে না।

ইরানি ফিসফিস করে বলল, "ঐ লোকটা আমাদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে কেন? আমি প্রথম থেকেই বলেছি না, ও বাজে লোক!"

দিপু বলল, "ঐ লোকটাও মেমারিতে নামবে!"

ইরানি বলল, "নামুক! তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি না! একটু ভাব করলেই ও ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।"

দিপু বলল, "এঃ, চেষ্টা করলেই হল! আমাদের কি বাচ্চা পেয়েছে নাকি?"

এই সময় রঘু এদিকে এসে পড়তেই দিপু তাকে আদ্ধেক বাদাম দিয়ে দিল।

রঘু বলল, "দিদি, আমরা দুপুরে খাব কোথায়? গাঁয়ে পৌঁছতে তো অনেক বেলা হয়ে যাবে!"

ইরানি বলল, "তোর এর মধ্যেই খাওয়ার চিন্তা? রেল-স্টেশানে যা পাই তা-ই খেয়ে নেব!"

এমনিতে কোনো কারণ নেই, তবু হঠাৎ দিপুর শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল। এরকম তার হয় মাঝে-মাঝে। এটা ঠিক ভয়ের কাঁপুনি নয়।

দিপুর মনে হল, এক্ষুনি এই রেলের কামরায় একটা কিছু ঘটবে ! একটা ভয়ংকর কিছু ! কী সেটা ? অ্যাকসিডেণ্ট ? লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ট্রেনটা উল্টে যাবে ? উল্টো দিক থেকে আর-একটা ট্রেন এসে ধাক্কা মারবে ? তা হলে তো এক্ষুনি ট্রেনটা থামানো দরকার। চেন টানলে ট্রেন থামে, দিপু শুনেছে। কোথায় চেন ? দিদিকে বলতে হবে কথাটা। কিন্তু দিদি যদি বিশ্বাস না করে ?

কিন্তু একটা কিছু যে ঘটবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হঠাৎ তার শরীরে কাঁপুনি লাগলেই একটা-না-একটা কিছু হয়ই।

দিপু কামরার লোকগুলোর মুখের দিকে একবার তাকাল। খাকি-প্যাণ্ট পরা লোকটি একমনে বাদাম চিবিয়ে যাচ্ছে। মারোয়াড়ি ভদ্রলোকটি ঘুমোচ্ছেন। কেউ কেউ কাগজ পড়ছে। এক কোণের সেই চার-পাঁচজন একবয়েসি যুবক চুপ করে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। ট্রেনটা এখন ছুটছে খুব জোরে ! এই লোকগুলো কেউ জানে না যে, একটু বাদেই ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাবে !

দিপু বলল, "দিদি, চেন টেনে ট্রেন থামালে কি ফাইন হয় ?"

ইরানি বলল, "হ্যাঁ। ঐ দ্যাখ না, লেখা আছে !"

দিপু বলল, "কিন্তু সত্যিই যদি খুব দরকার হয় ? তাহলেও কি ফাইন করবে ? দিদি, আমার মনে হচ্ছে, এক্ষুনি ট্রেনটা থামানো দরকার।"

ইরানি দিপুর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "ট্রেন থামানো দরকার ? কেন ? কী বলছিস পাগলের মতন ?"

শরীরে আর-একবার ঝাঁকুনি লাগতেই দিপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এক্ষুনি, আর সময় নেই !"

দিপু তার কথাটা শেষ করতে পারল না। তার মধ্যেই সেই পাঁচজন যুবক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন কড়া গলায় চেঁচিয়ে বলল, "যে যেখানে বসে আছ, সে সেখানেই থাকো। কেউ নড়বে না ! সাবধান !"

সেই যুবকটির হাতে একটা রিভলভার !

॥ ৪ ॥

দু'জন ছেলে দৌড়ে এসে দাঁড়াল দুটো দরজার সামনে। তাদের হাতে খোলা ছুরি। আর দু'জন দাঁড়াল কামরার দু' পাশে। রিভলভার-হাতে ছেলেটি ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, "কেউ উঠে দাঁড়াবে না, যে-যেখানে আছ বসে থাকো, টাকা-পয়সা যার কাছে যা আছে বার করে দাও চটপট, তাহলে কারুর গায়ে আঁচড় লাগবে না !"

দিপু বুঝতে পারল, এরা ট্রেন-ডাকাত। খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে এদের কথা থাকে। আগে তো এদের দেখে কিছুই বোঝা যায়নি, মনে হয়েছিল কলেজের ছাত্র ! দিপুর ধারণা ছিল, ডাকাতদের চেহারা খুব সাঙ্ঘাতিক হয়, তাদের মোটা-মোটা গোঁফ থাকে। এদের একজনেরও গোঁফ নেই।

লোকেরা সবাই পকেট থেকে টাকাকড়ি বার করে দিচ্ছে, একজন ভদ্রমহিলা কুঁইকুঁই করে কান্নার আওয়াজ বার করছেন। দু'জন ডাকাত একটা রেশন-ব্যাগে ভরে নিচ্ছে সব।

খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটি পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে বলল, "আমার কাছে মাত্তর এই একটা নোটই আছে। এটাও নেবে ?"

একজন ডাকাত বলল, "তোর হাতে ঘড়ি আছে, খুলে দে !"

খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটা বলল, "ঘড়ি ? এটা আমার ঘড়ি নয়, আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছি।"

রিভলভারধারী ডাকাতটি মুখ ফিরিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "কথা বলে দেরি করিয়ে দিচ্ছিস ? মাথার খুলি উড়িয়ে দেব ! শিগগির দে !"

খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটা মুখ কাঁচুমাচু করে ঘড়িটা খুলে দিল। তার হাত থেকে পাঁচ টাকার নোটটাও কেড়ে নিল একজন।

মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীটির মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তিনি দু' পকেট থেকে বার করে দিলেন কয়েক তাড়া নোট।

রিভলভারধারী বলল, "আরও টাকা আছে, বার করো!"

মারোয়াড়ি ভদ্রলোকটি বললেন, "আউর নেহি হ্যায়, সব কুছ দে দিয়া!"

ডাকাতটি বলল, "চালাকি পেয়েছ আমাদের সঙ্গে? মরতে চাও? কোমরের গেঁজেতে বাঁধা আছে ওটা কী? জামাটা তোলো!"

একজন জোর করে তার জামাটা তুলে টেনে বার করল দুটো টাকার থলে। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক হাপুস নয়নে কেঁদে উঠলেন।

দিপুদের যাওয়া-আসার খরচ দেওয়া হয়েছে ইরানির কাছে। ইরানি সেটা রেখেছে একটা ছোট ব্যাগে। ইরানি ব্যাগটা বার করে কোলের ওপর রেখেছে। দিপু তাকাল দিদির দিকে। দিদি খুব রাগী। কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে ঝগড়া করলে ওরা পট্ করে ছুরি চালিয়ে দেবে কিংবা গুলি করবে! যারা খুব নিষ্ঠুর, তারাই তো ডাকাত হয়। খাকি প্যান্ট পরা লোকটা পর্যন্ত বাধা দিতে সাহস পেল না।

একজন ডাকাত ইরানির সামনে দাঁড়াতেই ইরানি ব্যাগটা এক হাতে উঁচু করে ধরল।

রিভলভারধারী ডাকাতটি বলল, "ওর কাছ থেকে নিতে হবে না। আমরা মেয়েদের জিনিস নিই না!"

একটু দূরে যে-ভদ্রমহিলা কুঁইকুঁই করে কাঁদছিলেন, তিনি এই কথা শুনে কান্না থামিয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকালেন। ইরানি কিন্তু এই কথা শুনে খুশি হয়নি মনে হল।

দরজার কাছে যে ডাকাতটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে চেঁচিয়ে বলল, "এই নাম্বার থ্রি, চটপট কর না, স্টেশান এসে গেছে।"

দিপু তাকিয়ে দেখল, কামরাটাতে চারজন মহিলা আর দুটি বাচ্চা মেয়ে আছে। ডাকাতরা কিন্তু তাদের কাছ থেকে সত্যিই কিছু নিল না। একজন মহিলা তাঁর কান থেকে দুল খুলে ফেলেছিলেন, একজন

সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আসল সোনা, না ঝুটো ? যাই হোক, দরকার নেই আমাদের। আমরা মেয়েদের জিনিস ছুঁই না !"

একজন ডাকাত এবারে এসে দাঁড়াল দিপুর সামনে। দিপু তৈরি হয়েই ছিল। সে তার জমানো ছ'খানা আধুলি নিয়ে এসেছিল, প্যান্টের পকেটে হাতের মুঠোয় সেগুলো ধরা আছে।

একজন ডাকাত বলল, "এই খোকা, পকেটে কী আছে, বার করো !"

দিপু হাত বার করবার আগেই রঘু বলল, "আমাদের কাছে কিছু নেই, সত্যি কিছু নেই গো !"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, আমার কাছে আছে। এই যে দিচ্ছি !"

দিপু তার আধুলিগুলো ফেলে দিল ডাকাতদের থলিতে। সঙ্গে সঙ্গে ইরানি ছুটে এল সেখানে। ডাকাতটির সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র গলায় বলল, "এর মানে কী ? আপনারা মেয়েদের কাছ থেকে নেবেন না, অথচ ছোট ছেলেদের কাছ থেকে নিচ্ছেন কেন ?"

ডাকাতটি ধমক দিয়ে বলল, "বেশ করছি ! তুমি তোমার জায়গায় গিয়ে চুপ মেরে বোসো !"

ইরানি বলল, "না, আমি যাব না ! আমি জানতে চাই, আপনারা ছেলেদের কাছ থেকে নিচ্ছেন, মেয়েদের কাছ থেকে নিচ্ছেন না কেন ? ছেলেরা আর মেয়েরা কি আলাদা ?"

ডাকাতটি বলল, "আরে মলো যা ! এ মেয়েটা পাগলি নাকি ? মেয়েদের জিনিস না নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, তাও এঁড়ে তর্ক করতে এসেছে !"

ইরানি বলল, "কেন, মেয়েদের জিনিস ছেড়ে দেবেন ? নিলে সবার কাছ থেকেই নিতে হবে ! আমার কাছ থেকেও নিন !"

রিভলভারধারী দূর থেকে বলল, "এই চার নম্বর, কী হয়েছে রে ? দেরি করছিস কেন ?"

চার নম্বর বলল, "এই মেয়েটা ঝুটঝামেলা করছে !"

ইরানি তার হাতের ব্যাগটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল,

"আমি ডাকাতদের দয়া চাই না !"

সব কটা ডাকাত ইরানির দিকে ফিরে তাকিয়েছে। সেই মুহূর্তে একটা কাণ্ড হল।

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে একটা লাথি কষাল রিভলভারধারীর হাতে। সেই রিভলভারটি ছিটকে গিয়ে কামরার ছাদে লেগে আবার মাটিতে পড়ার আগেই খাকি প্যান্ট পরা লোকটি লুফে নিল সেটি।

রিভলভারটা উঁচু করে তুলে সে বলল, "এইবার ?"

ডাকাতগুলো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল একটুক্ষণের জন্য। এরকম যে হতে পারে, তারা তা কল্পনাই করতে পারেনি যেন। ট্রেনের গতিও কমে আসছে, একটু বাদেই স্টেশন এসে পড়বে।

দরজার কাছে যে দু'জন দাঁড়িয়ে ছিল তারা লাফিয়ে পড়ল বাইরে। দিপুর ইচ্ছে করল জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে। নিশ্চয়ই ওদের পা ভেঙে গেছে !

যে-ডাকাতটির হাতে রেশনের থলিটি ছিল, তার দিকে রিভলভারটি ঘুরিয়ে খাকি প্যান্ট পরা লোকটি বলল, "তুমি একটুও নড়বে না, চাঁদু ! তুমি নড়লেই তোমায় গুলি করব। আমার ঘড়িটা এবারে ফেরত দাও তো !"

কামরার অনেক লোকজন এবারে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ছুরি হাতে ডাকাতদুটো লাফিয়ে নেমে গেছে, বাকি তিনজনের কাছে এখন আর কোনো অস্ত্র নেই। কয়েকজন 'ধর' 'ধর' বলে ছুটে গেল তাদের দিকে।

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি টাকাভর্তি রেশন-ব্যাগটি কেড়ে নিয়েছে এর মধ্যে। একটা সিটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "শুনুন, আপনারা সবাই শুনুন ! স্টেশন এসে গেছে, ডাকাতগুলোকে তো পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে ঠিকই। টাকার থলেটাও কি

পুলিশের কাছে জমা দেব, না যার যার টাকা এখানেই ভাগ করে নেবেন ?"

সবাই একসঙ্গে হট্টগোল করে বলে উঠল, "না, না, আমাদের টাকা এখনই ফেরত চাই !"

খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটি বলল, "এই দেখুন, আমি শুধু আমার ঘড়ি আর এই পাঁচ টাকার নোটটা নিলুম। বাকি টাকার বিলিব্যবস্থা অন্য কেউ করুন।"

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক বললেন, "হামাকে দিন, হামার বেশি রুপেয়া আছে ! আপ তো কামাল কর দিয়া !"

আরও অনেকে প্রশংসা করতে লাগল খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটির। কেউ কেউ তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

লোকটি লজ্জা-লজ্জা মুখে বলল, "আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন ? ঐ মেয়েটির জন্যেই তো সব হল। ও ডাকাতদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল বলেই তো ডাকাতরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওরকম সাহসী মেয়ে আমি তো আগে কখনো দেখিনি !"

ইরানি নিজের ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা জানলার কাছে বসেছে। এসব কথা সে গ্রাহ্যও করল না, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

ট্রেনটা একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটি উল্টো দিকের দরজার কাছে এসে বলল, "আপনারা পুলিশের হাতে ঐ ছেলেগুলোকে তুলে দিন, আমি একটু পরে আসছি। তারপর ইরানির দিকে তাকিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ! আবার দেখা হবে !"

বলেই সে লাফিয়ে নেমে গেল লাইনে। ট্রেনটা এখনও একেবারে থামেনি। দিপু দেখল, লোকটি নেমেই দৌড়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। রিভলভারটা পকেটে ভরে ফেলেছে।

এই লোকটাও কি তবে পালাল ? না হলে রিভলভারটা সঙ্গে

নিয়ে গেল কেন ?

ট্রেনটা থামবার পর শুরু হল এক ঝঞ্ঝাট। প্রথম কিছুক্ষণ চলল চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি। কিছু লোক এতক্ষণ বাদে সাহস পেয়ে ডাকাত ছেলেগুলোকে চটাপট করে মারতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। একজন যাত্রী অভিযোগ করল যে, ডাকাতরা তার কাছ থেকে তিনশো টাকা নিয়েছিল, কিন্তু থলি থেকে সে ফেরত পেয়েছে মাত্র একশো পঁচিশ টাকা। অন্য একজন কেউ বেশি নিয়ে নিয়েছে।

সবাই একসঙ্গে মিলে ঘটনার বর্ণনা দিতে গেল বলে কারুর কথাই ঠিক বোঝা গেল না। তারপর এলেন পুলিশের বড়কর্তাগোছের একজন। তিনি ধমক দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কেউ কথা বলবেন না! আমি যাকে যা জিজ্ঞেস করব, শুধু তিনি তার উত্তর দেবেন।"

তারপর একে একে জিজ্ঞেস করে তিনি পুরো ঘটনাটি জেনে নিলেন। এবার তিনি জানতে চাইলেন, সেই লোকটি কোথায় গেলেন, সেই বীরপুরুষটি ? রিভলভারটাই বা কোথায় ?

একজন জানাল যে, সেই লোকটি রিভলভার নিয়ে নেমে গেছে একটু আগে।

পুলিশের বড়কর্তা বললেন, "সে কী! সে চলে গেল ? আপনারা কেউ কিছু বললেন না ? সে কোথায় গেল ? কেন গেল ? পুলিশের সঙ্গে কথা না বলে এরকমভাবে চলে যাবার মানে কী ?"

দু'জন লোক ইরানির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "সেই লোকটির সঙ্গে ঐ মেয়েটির চেনা আছে। ঐ মেয়েটি বলতে পারবে সে কোথায় গেল।"

ইরানি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না তো! আমি তো তাকে চিনি না! আগে কোনোদিন দেখিনি!"

এবারে আরও কয়েকজন পুলিশসাহেবকে বলল, "হ্যাঁ, স্যার, ওরা

সেই লোকটিকে চেনে। একসঙ্গে কামরায় উঠেছে। ওরা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। লোকটা বাদাম কিনে খাওয়াল ওদের।"

পুলিশের বড়কর্তা ইরানির কাছে এসে বললেন, "সত্যিকারের কী হয়েছিল বলো তো, বোনটি! লোকটির সঙ্গে তোমার কতদিনের চেনা?"

দিপু এবার দিদির সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে বলল, "এ আমার দিদি। আমরা খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটিকে চিনি না! উনি বাদাম কিনে আমাদের খেতে বলেছেন..."

একজন লোক বলল, "স্যার, আমি নিজের কানে শুনেছি, লোকটা নেমে যাবার সময় এই মেয়েটিকে বলেছে, "আবার দেখা হবে!"

পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে বললেন, "গোলমেলে ব্যাপার! ট্রেন তো বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না!"

ইরানির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "তোমাদের এই ট্রেনে যাওয়া হবে না, একটু নামতে হবে যে! তোমাদের কাছ থেকে একটা স্টেটমেণ্ট লিখিয়ে নিতে হবে!"

ইরানি আপত্তি জানাতেও কোনো লাভ হল না। পুলিশ অফিসারটি ইরানির পিঠের কাছে হাত দিয়ে কড়া গলায় বললেন, "চলো, চলো, দেরি করে লাভ নেই। তোমাদের এখন ছাড়া যাবে না!"

কামরার বাইরে প্ল্যাটফর্মে দারুণ ভিড় জমে গেছে। অনেকেই জানে না আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে। পুলিশ অফিসারের পাহারায় ইরানিকে কামরা থেকে নামতে দেখে দু'একজন চেঁচিয়ে উঠল, "মেয়ে-ডাকাত! মেয়ে-ডাকাত!"

॥ ৫ ॥

দিপু, ইরানি আর রঘু প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে লাগল পুলিশের সঙ্গে। আর তাদের পেছনে জমতে লাগল বিরাট ভিড়। দিপুর লজ্জা

করতে লাগল খুব। ইরানি রাগ-রাগ ভাব করে থুতনি উঁচু করে আছে।

ওদের নিয়ে যাওয়া হল স্টেশন মাস্টারের অফিসের ভেতর দিয়ে আর-একটা ছোট ঘরে। বাইরের ভিড় আটকানোর জন্য পুলিশ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

অফিসারটি বললেন, "বোসো, বোসো তোমরা। ভয় পাবার কিচ্ছু নেই।"

ইরানি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "আমরা ভয় পেতে যাব কেন? আমরা কি কোনো দোষ করেছি? আমরা একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি, আপনি অন্যায় ভাবে আমাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছেন!"

অফিসারটি বাঁ দিকের ভুরুটা অনেকখানি উঁচু করে তাকালেন ইরানির দিকে। তারপর বললেন, "ভাল, ভাল, ভয় না-পাওয়াই তো ভাল!"

তারপর তিনি রঘুর দিকে ফিরে বললেন, "আগে তুমি বলো তো, ঠিক কী কী ঘটেছিল ট্রেনের মধ্যে?"

দিপু একটু ঘাবড়ে গেল। রঘুটা একদম সত্যি কথা বলে না। সব সময় ও বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়।

রঘু বলল, "ঐ যে খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটা, ও আমাদের চিনেবাদাম খাওয়াল। তারপর দিপুদাদাকে বলল, 'তোমরা যেখানে যাবে আমিও তো সেখানে যাচ্ছি, বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।' প্রথমে যখন ডাকাতরা চ্যাঁচামেচি শুরু করে, তখন কিন্তু লোকটা ভয় পেয়েছিল, কিচ্ছু বলেনি। হাত থেকে ঘড়ি খুলে দিয়েছে। তারপর আমাদের দিদিমণি যখন ডাকাতের সর্দারের গালে এক চড় মারল..."

ইরানি বলল, "মোটেই আমি চড় মারিনি!"

অফিসার ইরানিকে বললেন, "বাধা দিও না, তোমার কথা পরে শুনব। হ্যাঁ, তারপর বলো, তোমার দিদিমণি ডাকাতের সর্দারকে চড় মারল, তারপর...?"

ইরানি আবার বলল, "বলছি তো আমি মারিনি !"

অফিসারটি এবারে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "ডোনট্ ইনটারাপ্ট ! বেশি কথা বললে তোমাদের সবাইকে লক্-আপে পুরে দেব !"

রঘু বলল, "দিদিমণি চড় মারেনি, হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে মেরেছিল।"

ইরানি কটমট করে রঘুর দিকে তাকিয়ে রইল।

অফিসারটি রঘুকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাকি প্যাণ্ট পরা লোকটাকে তোমরা আগে থেকেই চিনতে ?"

রঘু বলল, "ট্রেনে ওঠার আগে তো ? হ্যাঁ। হাওড়া প্ল্যাটফর্মে ও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। দিদিমণি তখন বলেছিল, লোকটা ভাল না !"

"তোমরা যেখানে যাচ্ছ, ঐ লোকটাও সেখানে যাচ্ছে ? তবে ও আগেই নেমে গেল কেন ?"

"কী জানি, ও বোধহয় ভুল করে কিছু ফেলে এসেছে !"

"তোমরা বর্ধমানের কোন্ গ্রামে যাচ্ছ ?"

"যে-গ্রামে জ্যাঠাবাবু থাকেন।"

"সে গ্রামের নাম কী ?"

"তা আমি জানি না। জ্যাঠাবাবুর বাড়ির সামনে দুটো তালগাছ আছে।"

এই সময় আর একজন পুলিশ অফিসার এলেন। মনে হয়, ইনি আরও বড় পুলিশ। বেশ ফর্সা আর লম্বা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা।

তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কেসটা কী ?"

আগের অফিসারটি বললেন, "স্যার, কেসটা বেশ পিকিউলিয়ার। চোরের ওপর বাটপাড়ির মতন। বর্ধমান লোকালে একদল ছিঁচকে ডাকাত যাত্রীদের সব টাকাকড়ি কেড়ে নিচ্ছিল। একটা লোক আবার সেই ডাকাতদের ঘায়েল করে তাদের রিভলভার কেড়ে নিয়ে মাঝপথে সটকে পড়েছে। অন্যদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে যে, সেই

সেকেণ্ড লোকটাকে এই ছেলেমেয়েরা চিনত !"

ইরানি জোরগলায় বলল, "ইনি ভুল বুঝেছেন। আমরা বারবার বলেছি যে, সেই লোকটাকে আমরা আগে কোনোদিন দেখিনি !"

"সেই লোকটা নামবার সময় বলে যায়নি যে, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ?"

"তা বলতে পারে। কিন্তু তার জন্য কি আমরা দায়ী ? আমরা লোকটাকে চিনি না !"

"যে-লোক রিভলভার নিয়ে পালিয়ে যায় সে অতি ডেঞ্জারাস লোক !"

দ্বিতীয় পুলিশ অফিসারটিকে দেখেই দিপুর মনে হয়েছিল, ইনি ভাল লোক। ইনি তাদের বেশিক্ষণ আটকে রাখবেন না।

ঠিক তা-ই হল, তিনি আর দু'একটা কথা শুনেই বললেন, "সেই লোকটা পালিয়ে গেছে, তা এদের শুধু-শুধু দেরি করিয়ে দিয়ে লাভ কী ? এক্ষুনি আর একটা ট্রেন আসছে না ? তাতে এদের তুলে দাও !"

বাইরে তখনও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। দিপুরা বেরিয়ে আসবার পরেই অনেকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কী হয়েছে ভাই ? কী হল ? পুলিশ কী বলল ?"

কারুর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ভি· আই· পি-দের মতন গম্ভীর মুখে হাঁটতে লাগল ওরা। একটা ট্রেন তক্ষুনি স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

এই ট্রেনে বেশ ভিড়, বসবার জায়গা নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার কোনো সুযোগ পেল না। প্রতিটি স্টেশনে ট্রেন থামতেই দিপু উঁকি মেরে দেখে নিতে লাগল নামটা। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল মেমারিতে।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই ইরানি বলল, "রঘু, তুই বাড়ি ফিরে যা ! তোকে পয়সা দিয়ে দিচ্ছি, এর পরে যে ট্রেন আসবে, তাতে তুই চলে যাবি !"

রঘুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, "কেন ? আমি কী করলুম ? মা আমাকে থাকতে বলেছেন আপনাদের সঙ্গে !"

ইরানি বলল, "না, আমি তোকে সঙ্গে নিতে চাই না ! তুই একটা মিথ্যেবাদী, পাজি কোথাকার ! তুই কেন বললি আমি ডাকাতদের চড় মেরেছি ? তোর জন্য লোকের কাছে আমাকে অপমান সইতে হবে ?"

দিপু জানে, ঐ যে পুলিশ অফিসারটি দিদিকে ধমক দিয়েছিলেন, দিদি সে-অপমান কিছুতে ভুলবে না। সব রাগ এখন রঘুর ওপর পড়বে !

দিপু বলল, "এই রঘু, তুই হাত জোড় করে বল যে, আর কোনোদিন মিথ্যে কথা বলবি না !"

রঘু তক্ষুনি হাত জোড় করে সে-কথা বলল, কিন্তু ইরানি তাতেও মানতে চায় না। সে বলল, "না, আমি ওকে কিছুতেই নেব না। আমি আর কোনোদিন ওর মুখ দেখতে চাই না !"

দিপু বলল, "দিদি, এখানে দেরি করলে যদি বাস না পাই ? এমনিতেই কত দেরি হয়ে গেছে ! শিগগির চলো !"

স্টেশনের বাইরে একটা বাস গজরাচ্ছে, এখুনি ছাড়বে। ওরা দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সেটা চলতে শুরু করতেই ইরানি বলল, "এটা ঘোড়াডাঙা যাবে তো ? ভুল বাসে উঠিনি তো !"

বাসের কণ্ডাকটার বলল, "হ্যাঁ, ঘোড়াডাঙা যাবে, তবে একটু ঘুরপথে যাবে। একটু আগেই একটা বাস অ্যাকসিডেণ্ট করেছে তো, রাস্তা আটকে আছে !"

দিপুর মাথার মধ্যে একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। একটু আগে একটা বাস অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে ? কত আগে ? কোন্ বাস ?

এই বাসের সব লোক সেই দুর্ঘটনা নিয়েই আলোচনা করছে। চল্লিশ মিনিট আগে যে ট্রেনটা এসেছিল, সেই ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসটা। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই ব্রেক ফেল করে একটা

লরিকে ধাক্কা মেরেছে। মারা গেছে পাঁচজন, আর হাত-পা ভেঙেছে কতজনের তার ঠিক নেই এখনও!

দিপু ইরানির দিকে তাকাল। আগের ট্রেনেই ওদের আসার কথা ছিল। ওরা সেই বাসেই উঠত, তাহলে এতক্ষণে ওদের কী অবস্থা হত কে জানে! পুলিশ অফিসারটি আগের ট্রেন থেকে ওদের নামিয়ে নিয়ে মহা উপকারই করেছে।

আসল উপকার করেছে খাকি প্যান্ট পরা লোকটা। সে নেমে যাবার সময় বলে গিয়েছিল, আবার দেখা হবে! সেই জন্যই তো এত কাণ্ড হল, দিপুর দৃঢ় ধারণা হল, ঐ লোকটির সঙ্গে শিগগিরই আবার দেখা হবে।

রঘু বলল, "আমরা খুব জোর বেঁচে গেছি। তাই না দিদিমণি?"

ইরানি যেন কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। সে খানিকটা বিরক্তভাবে বলল, "এ সব কী ঝঞ্ঝাট হচ্ছে রে বাবা! বাড়ি থেকে বেরুবার পর একটার পর একটা গণ্ডগোল! এখন ভালয় ভালয় পৌঁছতে পারলে হয়।"

বাসটা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু রাস্তা ধরে চলতে লাগল। দু' পাশের গাছপালা এসে জানলায় লাগছে। পুকুরধার দিয়ে, পুরনো মন্দিরের গা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথটা। ওরা জায়গা পেয়েছে বাসের একেবারে পেছনের সিটটাতে। মাঝেমাঝেই ওদের লাফিয়ে উঠতে হচ্ছে। তবু দিপুর চমৎকার লাগছে। অন্য দিনগুলো তো সব প্রায় একরকম কাটে। কিন্তু আজকের দিনটাতে কত রকম ঘটনা। ট্রেনে ডাকাতি দেখার সুযোগ ক'জনের হয়? তারপর পুলিশের জেরা। দ্বিতীয় পুলিশ অফিসারটি না এলে তাদের কি আজ ওখানেই আটকে থাকতে হত? জেলখানার মধ্যে? তা হলে মন্দ হত না, একটা জেলখানা দেখা হয়ে যেত! ঠিক আগের বাসটাতেই অ্যাকসিডেন্ট! মরে যাওয়ার চেয়েও খারাপ হল হাত-পা ভেঙে বেঁচে থাকা!

দিপু খুব মন দিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িটা কল্পনায় দেখবার চেষ্টা

করল। হ্যাঁ, বাড়িটাকে সে দেখতে পাচ্ছে। দুটো তালগাছ, তারপর পেয়ারা-বাগান, একপাশে বেগুনের ক্ষেত, আর-এক পাশে পুকুর··· । কিন্তু জ্যাঠামশাইকে তো দেখা যাচ্ছে না ! কোথায় গেলেন তিনি ?

"ঘোড়াডাঙা ! ঘোড়াডাঙা !"

কণ্ডাকটারের চিৎকার শুনে চমকে উঠল দিপু। ওরা পৌঁছে গেছে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়ল তিনজন।

এবার গোরুর গাড়ি চেপে যেতে হবে। কিন্তু যেখানে তারা বাস থেকে নামল, সেটা একটা হাটতলা। আজ হাটবার নয়, তাই চারদিক একেবারে খাঁখাঁ করছে। গোরুর গাড়ি নেই একটাও, শুধু একটা চায়ের দোকান খোলা আছে।

দিপু চায়ের দোকানে গোরুর গাড়ির খোঁজ করতে গেল। বাইরের টুলে বসে ছিল দু'জন লোক। তারা বলল, "আজ আর গোরুর গাড়ি পাওয়ার কোনো আশা নেই। হাটবার ছাড়া অন্যদিন গোরুর গাড়ি থাকে না।"

তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কার বাড়িতে যাবে ভাই ?"

দিপু জ্যাঠামশাইয়ের নাম বলল।

লোকদুটি চোখ বড় বড় করে তাকাল। তারপর বলল, "পেয়ারাবাগানের রামবাবু তো ? তিনি তোমার জ্যাঠামশাই ? কিন্তু তাঁকে তো ক'দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না !"

॥ ৬ ॥

দেখতে দেখতে দিপুদের চারপাশে আবার একটা ভিড় জমে গেল। গ্রামের লোকদের তো অফিসে যেতে হয় না, তাই দুপুরের দিকেও অনেক লোক এমনি এমনি ঘুরে বেড়ায়। তারা এসে বলতে লাগল, 'কী হয়েছে ? কী হয়েছে ? রামবাবুকে খুঁজছে ? ইশ্, কী যে

হল, অমন ভাল মানুষটা, কোথায় যে গেল !'

একজন মোটাসোটা মোড়লমতন চেহারার লোক বলল, "সেই যে গত সোমবারে বাজ পড়ল ওনার বাগানে, পেয়ারাগাছগুলো পুড়ে গেল ! সেই দুঃখেই রামবাবু কোথায় চলে গেলেন ! বড় সাধের পেয়ারাবাগানখানা ছিল ওনার !"

আর একজন ধুতিপরা, খালি-গা লোক বলল, "বাজ মানে কী, ওরে বাপ রে ! বাপের জন্মে এমন বাজ-পড়া দেখিনি । পুকুরের জল পর্যন্ত শুষে নিয়েছে ! আমি দেখতে গেসলুম !"

দিপু বাজ পড়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না । বর্ষাকালে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, তারপর মেঘে-মেঘে গুড়ুম-দড়াম আওয়াজ হয় । কেন এরকম হয় তা দিপু জানে । কিন্তু আকাশের বিদ্যুৎ পুকুরের জল শুষে নেয় কী করে ? বাজ কি কোনো জ্যান্ত জিনিস যে তার জলতেষ্টা পাবে ?"

মোড়লমতন লোকটি দিপুকে বলল, "তোমরা এত দূরের পথ ঠেঙিয়ে এসেছ, খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই ! চলো, আমার বাড়িতে চলো, একটু জিরিয়ে নেবে ।"

ইরানি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে । দিপু একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, "না, আমরা জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতেই আগে যাব !"

"সে-বাড়িতেও তো কেউ নেই । এই দুপুর-রোদে সেখানে গিয়ে কী করবে ? খাবে-দাবে কোথায় ? আমাদের গ্রামে এসেছ, না-খাইয়ে তোমাদের কি ছাড়তে পারি ?"

অন্য দু' তিনজন লোক 'তা তো বটেই, তা তো বটেই' বলে উঠল ।

দিপু জানে, তার দিদি অচেনা লোকের বাড়িতে কিছুতেই খেতে চাইবে না । দিদির অনেক রকম পিটপিটিনি আছে । যদিও খিদে পেয়েছে বেশ !

একজন লোক বলল, "রামবাবুর বাড়িতে যে কাজ করত সেই মধুকে যেন সকালবেলা একবার দেখেছিলাম এদিকে ?"

আর একজন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো একটু আগে মধুকে দেখলাম পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছে।"

মোড়লমতন লোকটি বলল, "ডাক তো, মধুকে ডেকে নিয়ে আয় তো !"

সাইকেল-ভ্যান চালিয়ে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের পাশে। সেই লোকটি বলল, "মধু বাড়ির দিকে ফিরে গেল দেখলুম এই মাত্তর !"

দিপু সেই লোকটিকে বলল, "আপনি আমাদের ঐ ভ্যানে করে পৌঁছে দেবেন ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, উঠে বোসো ! মাত্তর তো দেড় মাইল রাস্তা !"

সাইকেল-ভ্যানে মালপত্তর নিয়ে যায়, মানুষও যায় অনেক সময়। পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। দিপু, ইরানি আর রঘু তিনদিকে বসল পা ঝুলিয়ে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, মাঝে-মাঝেই ঝাঁকুনিতে ওরা লাফিয়ে উঠছে।

ইরানি বলল, "এখানে পোস্ট অফিস আছে। আগে ওখানে পৌঁছে ভাল করে খোঁজ-খবর নিই। তারপর বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।"

রঘু বলল, "এই ভ্যানওয়ালা দাদাকে বলতে হবে আমাদের এস্টেশানে পৌঁছে দিতে। মা বলে দিয়েছেন, রাত্তিরের মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে।"

ইরানি বলল, "উঁহুঃ, আজ আর ফেরা হবে না। জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ না নিয়ে ফিরব কী করে ?"

রঘু বলল, "জ্যাঠাবাবু কলকাতাতেই চলে গিয়েছেন। এখেনে বাজ পড়ে সব নষ্ট হয়ে গেছে তো !"

ইরানি বলল, "শুনলি না, তিনদিন ধরে জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ! কলকাতায় যেতে বুঝি তিনদিন লাগে ?"

দিপু কোনো কথা বলছে না। সে চেয়ে আছে মাঠের দিকে।

রাস্তার দু' দিকেই মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে, এখন ফাঁকা। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে গাছপালার সারি। এর মাঝখানে আর কোনো বাড়িঘর নেই। রোদ ঝকঝক করছে। দিপুর মনে হচ্ছে সেই রোদ্দুরের মধ্যে কী যেন দুলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। এক এক জায়গায় রোদ্দুর যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তিমি মাছ যেমন ফোয়ারার মতন জল ছুঁড়ে দেয় সেইরকম কোনো-কোনো জায়গায় আলো উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে।

ইরানি আর রঘুর মুখের দিকে তাকাল দিপু। ওরা কথাই বলে যাচ্ছে। রোদ্দুরের মধ্যে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না? ওদের ডেকে দেখাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। অনেক সময়ই এমন হয়, দিপু যা দেখতে পায় অন্যরা তা দেখে না।

খানিকদূর যাবার পর দেখা গেল সামনে দিয়ে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটি বেশ লম্বা আর বলশালী, কুচকুচে কালো গায়ের রং, খালি গা।

সাইকেল ভ্যানওয়ালা বলল, "ঐ তো মধু!"

দিপুর মনে পড়ল, আগেরবার এসে একে কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিল, ভাল করে ভাব হয়নি। জ্যাঠামশাই ওকে ঝাড়গ্রামে পাঠিয়েছিলেন গাছের চারা আনবার জন্য।

ভ্যানটা কাছাকাছি যেতেই দিপু নেমে পড়ে লোকটির সামনে গিয়ে বলল, "ও মধুদা! আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নেবার জন্য!"

লোকটি অবাক হয়ে তাকাল দিপুর দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে রঘু আর ইরানিকে দেখল, তারপর বলল, "কলকাতা থেকে? বাবুর ছেলে কোথায়?"

দিপু বলল, "দাদার পরীক্ষা। তাই দাদা আসতে পারেনি। আমি আর দিদি এসেছি। আমাদের মনে আছে আপনার? সেই যে দু' বছর আগে এসেছিলুম?"

মধু একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী যে হল ! বাবু কোথায় চলে গেলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমায় সেদিন দুপুরবেলা বললেন, শরীরটা ভাল লাগছে না রে মধু, মাথা ঘুরছে। আমি বললুম, হেল্‌থ সেণ্টারের ডাক্তারবাবুকে খবর দেব ? উনি বললেন, থাক্, আজকের দিনটা দেখি ! তারপর সন্ধেবেলা সেই কাণ্ড !"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "কী কাণ্ড ?"

মধু বলল, "আমি ঘোড়াডাঙায় গেসলুম পটাস সার আনতে। ফিরে এসে দেখি, পুকুরঘাটে বাবু কাত হয়ে পড়ে আছেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি দু' তিনবার ডাকলুম, তাও সাড়া দিলেন না। আমি দৌড়ে এসে ধরে দেখি, বাবু অজ্ঞান। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমে ভেবেছিলুম, বুঝি বা মরেই গেছেন। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে মুখে ঝাপ্‌টা দিতে চোখ মেলে তাকালেন।"

ইরানিও ভ্যান থেকে নেমে পড়েছে। সে এই কথা শুনে দিপুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। বাবা ঠিক এই কথা বলেছিলেন। জ্বরের ঘোরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জ্যাঠামশাই পুকুরঘাটে একা-একা পড়ে আছেন। এরকম কী করে হয় ?

দিপু জিজ্ঞেস করল, "তারপর ?"

মধু বলল, "আমাকে দেখে বাবু বললেন, 'কে, মধু ? এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম বুঝি ? আমায় একটু ধর তো, উঠে দাঁড়াই ! পায়ে চোট লেগেছে।' আমি বাবুকে ধরে ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলুম। বাবু একটু লেংচে লেংচে হাঁটছিলেন। নিজেই কী সব ওষুধ খেলেন, বললেন, পরের দিন ডাক্তারবাবুকে খবর দিলেই চলবে। রাত্তিরে ভাত-টাত কিছু খেতে চাইলেন না। শুয়ে পড়লেন। সকালবেলা উঠে দেখি, বাবু নেই !"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ?"

"বাবু তো কোনোদিন দরজা বন্ধ করেন না !"

"কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ? পায়ে চোট লেগেছিল, উনি

নিজে-নিজে নিশ্চয়ই কোথাও যাবেন না !"

"জোর-জবরদস্তির চিহ্ন তো কোথাও নেই, দিদিমণি ! পাশের ঘরেই কেষ্ট বলে একটা ছেলে শোয় । সেও কোনো শব্দ শোনেনি । তবে মাঝরাতে বাবু বোধহয় একবার নিজেই নেবুবাগানে গিয়েছিলেন ।"

"লেবুবাগান কোথায় ? কত দূরে ?"

"বাড়ির পাশেই তো । বাবু নানারকম গন্ধনেবুর গাছের বাগান করেছিলেন তো ! পেয়ারাবাগানটা পুড়ে গেল, তারপর থেকে বাবু প্রায়ই নেবুবাগানে গিয়ে বসে থাকতেন ।"

"জ্যাঠামশাই যে রাত্তিরে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তা কী করে বোঝা গেল ?"

"রাত্তিরবেলা বেরুলে বাবু সাধারণত একখানা লাঠি আর টর্চ নিয়ে বেরুতেন । নেবুবাগানের মাঝখানটায় বাবুর লাঠিখানা পড়েছিল ।"

সাইকেল ভ্যানওয়ালা বলল, "ও মধুদাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি ! তোমার বাবুর তো একখানা বেশ ভাল সাইকেল ছিল । সেটাও চুরি গিয়েছে শুনছি ?"

মধু বলল, "সেটা চুরি গিয়েছে বাবু চলে যাবার দু'দিন আগে । থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল ।"

ইরানি হাতব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে ভ্যানওয়ালাকে বলল, "এই নিন । আপনাকে আর আসতে হবে না । বাকিটা পথ আমরা হেঁটেই যাব ।"

ভ্যানওয়ালা জিভ কেটে বলল, "না, না গো, দিদি, এইটুকুনি পথ এগিয়ে দিয়েছি, এজন্য আবার টাকা নেব কী ! তোমরা আমাদের গাঁয়ে এয়েছ । রামবাবু বড় ভাল লোক ছিলেন । গরিব মানুষদের কত উপকার করতেন । আহা, এমন মানুষটা...."

সাইকেল ভ্যানওয়ালাকে বিদায় দিয়ে ওরা হেঁটে হেঁটে কথা বলতে বলতে এগোতে লাগল । এখন জোড়া-তালগাছ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ।

ইরানিই মধুর সঙ্গে কথা বলছে বেশি। দিপু ঠিক মন দিতে পারছে না। সে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে একটা কিছু দেখবার চেষ্টা করছে।

রাত্তিরবেলা জ্যাঠামশাই একটা লাঠি আর টর্চ নিয়ে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন। কেন ?

দিপু যেন স্পষ্ট দেখতে পেল জ্যাঠামশাইকে। আকাশে মেঘ, একটুও জ্যোৎস্না নেই। অন্ধকার লেবুবাগানের মধ্যে জ্যাঠামশাই টর্চ জ্বেলে ব্যস্ত হয়ে কী যেন খুঁজছেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি হাঁটছেন আর টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন চারদিকে। কী খুঁজছেন তিনি ?

॥৭॥

একটু আগেই রোদ ঝকঝক করছিল, হঠাৎ আকাশটা কালো হয়ে এল আর ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সুতরাং বাকি রাস্তাটুকু ওদের ছুটে আসতে হল।

বাগানের মধ্যে ছোট্ট একটা বাংলো-বাড়ি। সিমেন্টের মেঝে, আর দেয়াল, ওপরে কিন্তু খড়। খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই বাড়ির বারান্দা থেকেই ডানদিকের পেয়ারাবাগানটা দেখতে পাওয়া যায়। সব গাছই পোড়া-পোড়া, যেন খুব আগুন লেগেছিল। বাজ পড়েছিল ওখানেই। দিপু ভাবল, বাজ পড়ায় যদি ওরকম ভাবে গাছ পুড়ে যায়, তাহলে ওখানে তখন কোনো মানুষ থাকলে সে নিশ্চয়ই পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেত!

দৌড়ে আসবার সময় ওরা বেশি ভেজেনি, কিন্তু ইরানি সব সময় ফিটফাট থাকতে ভালবাসে। সে জিজ্ঞেস করল, "বাথরুমটা কোথায় ?"

কলকাতার মতন এখানকার বাড়িতে শোবার ঘরের পাশেই বাথরুম থাকে না। বাথরুমটা একটু দূরে, উঠোন পেরিয়ে, লেবুবাগানের পাশে, বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া মুশকিল। রঘুরই বয়েসী

একটা ছেলে থাকে এখানে, তার নাম কেষ্ট। সে বলল, "চলুন দিদি, আমি আপনাকে ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্যাগ থেকে তোয়ালে বার করে ইরানি চলে গেল কেষ্টর সঙ্গে।

মধু বলল, "তোমরা দাদারা খেয়ে আসোনি তো? বেলা হয়ে গেছে অনেক। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়।"

রঘু বলল, "হ্যাঁ, বেশ খিদে পেয়েছে। খিচুড়ি বসিয়ে দিন না। যদি বলেন তো আমিও রান্নার যোগাড় করতে পারি।"

মধু বলল, "না, রান্নার লোক আছে।" তারপরই সে হাঁক পাড়ল, "এককড়ি, ও এককড়ি, একবার ইদিকে এসো তো!"

দিপু এর মধ্যে একবার জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরটা ঘুরে দেখে এসেছে। সে ঘরে জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই। শুধু একটা খাট আর একটা জামা-কাপড়ের আলনা। কোনো আলমারি, বা বাক্স-টাক্স কিচ্ছু নেই। জ্যাঠামশাই টাকা-পয়সা রাখতেন কোথায়? কিংবা দরকারি কাগজপত্তর?

দিপু জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এখানে ক'জন আছেন?"

মধু বলল, "এই তো আমি আছি। আমিই সব দেখাশুনো করি। আর কেষ্ট খুচরো কাজকর্ম করে, এককড়ি রান্নাবান্নার দিকটা দেখে। আর মাঝে-মাঝে কিছু ঠিকে-লোক রাখা হয়। এখানে থাকি আমরা এই তিনজনই। কোনোদিন কোনো গণ্ডগোল হয়নি।"

"কে যেন বলল, কয়েকদিন আগে এখান থেকে একটা সাইকেল চুরি হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, সাইকেলটা পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো ছেলেপিলে দুষ্টামি করে নিয়ে গেছে মনে হয়। আমাদের বাগানের জিনিস কেউ চুরি করে না। বড়বাবু অতি ভালমানুষ ছিলেন।"

দিপু গম্ভীরভাবে মুখ নিচু করে রইল। তদন্ত করার সময় ডিটেকটিভরা যে-রকম ভাবে প্রশ্ন করে সে সেইরকম এলোমেলো কিছু প্রশ্ন চিন্তা করতে লাগল। এমন কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, যার উত্তর এরা আগে থেকে ভেবে রাখেনি।

কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই এককড়ি এসে হাজির। তাকে দেখে দিপু অবাক। রান্নার ঠাকুর কোথায়, এ যে একজন সাধুবাবা! মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, গেরুয়া কাপড় আর চাদর গায়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বেশ বুড়ো মতন, মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব।

দিপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইটি কে?"

মধু বলল, "বড়বাবুর ভাইপো-ভাইঝি এসেছেন। আমি আজই কলকাতায় চিঠি পাঠালুম। যাই হোক, এনারা কিছু খেয়ে আসেননি, খুব তাড়াতাড়ি কিছু বানিয়ে দাও। খিচুড়ি যদি হয়, আলু-বেগুন তো আছেই।"

এককড়ি রান্নার কথায় পাত্তা না দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "গতিক মোটেই সুবিধের নয়! এসব কী শুরু হয়েছে? খুব খারাপ! খুব খারাপ!"

মধু বলল, "আবার কী হল?"

এককড়ি বলল, "চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছ না? এ কী অলুক্ষুনে বৃষ্টি? এই সময় কি কখনো বৃষ্টি হয়? আর দ্যাখো না, আমাদের এখানেই বৃষ্টি, আর দূরের মাঠ শুকনো খটখটে।"

মধু বিরক্ত ভাবে বলল, "এরকম বৃষ্টি কি নতুন দেখছ? শেয়াল-কুকুরের বিয়ে কখন হয় জানো না?"

এককড়ি বলল, "আসল কথাটা কী জানো? তোমরা বুঝবে না! কিন্তু আমি ঠিক বুঝেছি। বড়বাবুকে আসলে ওরা ভুল করে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা আমাকে ধরতে এসেছিল। আমি ঠিক জানি!"

দিপু এবার জিজ্ঞেস করল, "ওরা মানে কারা?"

এককড়ি বলল, "সে তোমরা বুঝবে না – তোমরা বুঝবে না!"

আবার সে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল উঠোনে।

মধু নিজের মাথার কাছে আঙুল ঘুরিয়ে এককড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওর মাথার গোলমাল আছে। কী যে কখন বলে, তার মানে বোঝা যায় না। তবে লোকটা রাঁধে ভাল!"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "উনি কি সাধু?"

মধু বলল, "কে জানে ! সাধুর মতন জামা-কাপড় পরলেই কি আর লোকে সাধু হয় ? শক্তিগড়ের হাটে বড়বাবুর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে বড়বাবু ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেই থেকে রয়ে গেছে।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এখানে কারুর ঝগড়া হয়েছিল ?"

মধু জিভ কেটে বলল, "না না না ! বড়বাবু একেবারে মাটির মানুষ, এদিকের সব লোক তাঁকে ভালবাসে। এমন-কি কেউ কেউ তাঁকে ঠকাতে গেলেও তিনি রাগ করতেন না। হাসিমুখে বলতেন, ওরে, যে অন্যকে ঠকাতে যায়, সে নিজেই বেশি ঠকে।"

দিপু কপাল কুঁচকে রইল। সমস্ত রহস্য-কাহিনীতেই সে পড়েছে যে, প্রত্যেক অপরাধের পেছনেই একটা মোটিভ থাকে। জ্যাঠামশাইকে যদি কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার মতলব কী হতে পারে ? জ্যাঠামশাইকে আটকে রেখে তারপর মুক্তিপণ চাইবে ? এইরকম কারণে ডাকাতরা সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েদেরই ধরে নিয়ে যায়, এরকম একজন বয়স্ক মানুষকে তো নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায় না।

ইরানি ফিরে এসে বলল, "যা দিপু, তুইও মুখ-হাত ধুয়ে আয়। মুখখানা তো ধুলোতে কালো হয়ে গেছে।"

তারপরই সে মধুর দিকে ফিরে বলল, "লেবুবাগানে কয়েকটা গাছ কে উপড়ে ফেলেছে ?"

মধু চমকে গিয়ে বলল, "গাছ উপড়ে ফেলেছে ? সে কী ? না, না, ওসব গাছ তো খুব দামি।"

ইরানি বলল, "আমি যে এইমাত্র দেখে এলাম। চার পাঁচটা গাছ কারা যেন তুলে ফেলেছে। আজকেই তুলেছে মনে হল !"

মধু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে ?"

কেষ্ট বলল, "আমিও তো তাই দেখলুম। কেউ মাটি খুঁড়েছে, গাছগুলো তুলে গর্ত করেছে।"

মধু বলল, "আমি গাঁয়ে গিয়েছিলুম, তুই তো ছিলি এখানে. কে এসে গাছ উপড়ে ফেলল, তুই দেখলি না ?"

কেষ্ট বলল, "কী করে দেখব ? দিনের বেলা কি এসেছে নাকি ? নিশ্চয় রাত্তিরের অন্ধকারে কেউ এসেছিল।"

মধু বলল, "রাত্তিরে কেউ এসে নেবুগাছ কেটে ফেলবে কেন ? গাছে তো এখন নেবু নেই। সব পাড়া হয়ে গেছে !"

কেষ্ট বলল, "বড়বাবু নেবুবাগানে মাঝরাত্তিরে গেসলেন কেন, সেটা ভাবো আগে !"

ইরানি বলল, "এটা ঠিক বলেছে ! জ্যাঠামশাই মাঝরাত্তিরে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন। তারপর কাল রাত্তিরে আবার কেউ এসেছিল ওখানে। কিছু খোঁজাখুঁজি করতে নিশ্চয়ই। কী আছে ওখানে !"

মধু বলল, "নেবুবাগানে আবার কী থাকবে ?"

দিপু বলল, "বৃষ্টি কমে গেছে। আমি একবার গিয়ে দেখতে চাই।"

সবাই মিলে চলে এল লেবুবাগানে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সেই বাগান। প্রায় দেড়শো-দুশো গাছ নিয়ে জঙ্গলের মতন। জায়গাটায় খুব সুন্দর গন্ধ।

গাছগুলো সব লাইন করে সাজানো। তার মধ্যে এক লাইনের ঠিক ছ'টা গাছ কেউ তুলে ফেলে দিয়েছে। গাছগুলো সব প্রায় একমানুষ সমান উঁচু। এত বড় গাছ টেনে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। শাবল বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে গোড়াগুলি আগে খুঁড়ে নেওয়া হয়েছে মনে হয়। কয়েকটা বেশ বড় বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে।

গাছগুলোর এই রকম অবস্থা দেখে মধু খুব দুঃখ পেয়েছে। সে কপালে হাত দিয়ে বলল, "ছি ছি ছি ছি ! কত কষ্ট করে বড়বাবু আর আমি এই গাছগুলো লাগিয়েছি ! কে এমন সর্বনাশ করল ?"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "জ্যাঠাবাবুর লাঠিটা কোথায় পাওয়া গিয়েছিল ?"

কেষ্ট বলল, "এইখেনটাতেই গো দিদিমণি। ঠিক এইখেনটায় বড়বাবুও রাত্তিরে এখেনেই এয়েছিলেন।"

ইরানি মধুর দিকে ফিরে জানতে চাইল, "জ্যাঠামশাই কি এখানে কিছু পুঁতে রেখেছিলেন বলে আপনার মনে হয় ? আপনি নিশ্চয়ই তাহলে সেটা জানতেন ?"

মধু বলল, "এখানে আবার কী পুঁতে রাখবেন তিনি ! ঘোড়াডাঙায় ব্যাঙ্ক হয়েছে, টাকা-পয়সা তো সব সেখানেই জমা পড়ে। বড়বাবুর কাছে আর তো কোনো দামি জিনিস ছিল না।"

দিপু লেবুবাগানের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, মধু তাকে বলল, "উঁহু, ভেতরে যাবেন না। এই গাছে কাঁটা আছে, গায়ে ফুটে যাবে !"

দিপু বলল, "আমি সাবধানে যাব !"

গুঁড়ি মেরে নিচু হয়ে সে দেখল, ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। বেশি দূর দেখা যায় না। একজন মানুষ এর মধ্যে ঢুকে অনায়াসে হারিয়ে যেতে পারে।

দিপুও লেবুবাগানের মধ্যে হারিয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

দিপু গুঁড়ি মেরে মেরে এগোতে লাগল সামনের দিকে। প্রথমে যতটা অন্ধকার মনে হয়েছিল, বাগানের ভেতরটা তত অন্ধকার নয়। আবছামতন, এক-এক জায়গায় রোদ্দুর এসে পড়েছে বর্শার ফলকের মতন। মাঝে-মাঝে কাঁটার খোঁচা লাগছে দিপুর পিঠে।

দূর থেকে ইরানি ডাকল, "এই দিপু, বেশি দূর যাসনি ! এবারে চলে আয়।"

দিপু উত্তর দিল না।

সে দেখতে পেল, এখানেও এক জায়গায় দুটো গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। গাছ দুটো অন্য গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে,

দুটোর গোড়াতেই বেশ বড় গর্ত। কেউ শাবল দিয়ে খুঁড়েছে।
দিপু বুঝতে পারল না, এই ভাবে লেবুগাছগুলোকে মেরে ফেলে কার কী লাভ।
তারপরই সে দারুণ চমকে উঠল। চিৎকার করে বলল, "দিদি, দিদি! মধুদাকে একবার শিগগির এখানে পাঠিয়ে দে!"
ইরানি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী দেখলি ওখানে?"
দিপু বলল, "জ্যাঠামশাই!"
সামনেই আর-একটা জায়গায় চার-পাঁচটা গাছ উপড়ে কিছুটা জায়গা ফাঁকা করা হয়েছে। সেইখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের দেহ। ধুতি পরা, খালি গা।
দিপুর বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে। তিন দিন ধরে জ্যাঠামশাই পড়ে আছেন এখানে। বেঁচে আছেন না মরে গেছেন? দিপু ছুঁতে সাহস পাচ্ছে না।
সে আস্তে-আস্তে ডাকল, "জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই!"
প্রথমে ছুটে চলে এল রঘু। দিপুর পাশে পৌঁছে বলল, "ওমা, কী হয়েছে? মেরে ফেলেছে?"
দিপু রঘুকে বাধা দিয়ে বলল, "বেশি কাছে যাবি না। আগে পুলিশ এসে দেখবে। দ্যাখ্ তো, এখানে কারুর পায়ের দাগ আছে কি না!"
মধু অন্য একটা দিক দিয়ে ঘুরে এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বাগানের মধ্যে। দিপুকে প্রথমটায় দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গো, দিপুবাবু, কোথায় তুমি? কী হয়েছে?"
দিপু বলল, "এই যে, এদিকে আসুন!"
মধু কাছে আসবার পর দিপু বলল, "আপনারা বাগানটা ভাল করে খুঁজেও দেখেননি? তিন দিন ধরে উনি এখানে পড়ে আছেন।"
মধুর ভুরু কুঁচকে গেল। তারপর বলল, "এ কে?"
মধু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই দিপু বলল, "এখন ছোঁবেন না। আগে পুলিশ আসুক।"
মধু বলল, "এ তো বড়বাবু নয়!"

রঘু বলল, "ও দাদাবাবু, লোকটা বেঁচে আছে। নিশ্বাস ফেলছে।"

মধু ধমক দিয়ে বলল, "অ্যাই! তুই কে রে?"

এবারে লোকটি মুখ ফেরাল। জায়গাটায় আলো কম বলে দিপু আগে বুঝতে পারেনি। লোকটির মুখভর্তি দাড়ি, মাথার চুলও জট-পাকানো।

লোকটি বলল, "আঃ, বড্ড জ্বালাতন করো। কোথাও একটু নিশ্চিন্দে ঘুমুবার জো নেই!"

মধু বলল, "যাচ্চলে! এ তো পাগলা মুরশেদ! এই ব্যাটা, তুই এখানে কী করছিস?"

দিপু একেবারে হতবাক্। সে যেন ধরেই নিয়েছিল যে, সে জ্যাঠামশাইয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। কষ্ট হবার বদলে তার উত্তেজনা হচ্ছিল অনেক বেশি, কেননা এতবড় একটা কৃতিত্ব তার একার। কিন্তু, তার বদলে একটা পাগল!

কাঁটার ভয় দমন করে ইরানিও চলে এসেছে ভেতরে। অনেকখানি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, "এ কী, এখানে একজন লোক রয়েছে? এ কে?"

মধু বলল, "ও একটা পাগল!"

দাড়িওয়ালা লোকটি মুখ ভেংচিয়ে বলল, "আমি পাগল না তোর বাপ পাগল! তোর চোদ্দ গুষ্ঠি পাগল!"

রঘু হিহিহিহি করে হেসে উঠল। ইরানি তার দিকে কটমট করে তাকাতেই মাঝপথে থেমে গেল সে।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটি এখানে কী করছে? এই সব গাছ ও তুলে ফেলেছে?"

মধু জিজ্ঞেস করল, "এই মুরশেদ, তুই এতগুলো গাছ মেরেছিস কেন রে, হতভাগা? আজ মেরে তোকে শেষ করব!"

লোকটি সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি হতভাগা না তুই হতভাগা? আমি গাছ মারব কেন রে? গাছকে যারা কষ্ট দেয়, তারা কি মানুষ? তারা সব ভূত!"

তারপর সে ইরানির দিকে ফিরে বলল, "বুঝলে দিদি, এখানে এসে দেখলুম, কতকগুলোন তাজা-তাজা গাছ ভুঁয়ে পড়ে আছে। তাই দেখে বড় কষ্ট হল। একটুখানি কাঁদলুম বসে-বসে। তারপর কখন জানি ঘুম এসে গেল!"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "আপনি এই লেবুবাগানের মধ্যে এসেছিলেন কেন?"

লোকটি বলল, "আমি তো এখানে প্রায়ই আসি। বেশ নিরিবিলি, শান্ত জায়গা। ঘুমিয়ে আরাম। কেউ ডিসটার্ব করে না।"

দিপু চমকে উঠল। লোকটি ইংরিজি জানে? চেহারা দেখলে বিশ্বাস হয় না। মনে হয় সাধারণ চাষাভুষো।

মধু ধমক দিয়ে বলল, "ব্যাটা, এটা তোর ঘুমুবার জায়গা? এত দামি দামি সব গাছ!"

লোকটি বলল, "বেশ করব! আমার যেখানে ইচ্ছে ঘুমুব। বড়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। বড়বাবু বলেছিলেন, তা বেশ বেশ, তোর ইচ্ছে হয় তো ঘুমুবি এখানে। লেবুপাতার বাতাস লাগলে শরীল ভাল হয়। বড়বাবু আমাকে পারমিশান দিয়েছেন!"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "এই সব গাছ কে নষ্ট করছে, আপনি জানেন?"

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। ঐ ওরা।"

সে পেছন দিকে বুড়ো আঙুল দেখাল।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "ওরা মানে কারা?"

"সে তোমরা বুঝবে না, দিদি। তাদের চেনা বড় মুশকিল!"

"তারা কি এই গ্রামেরই লোক?"

"কী যে বলো, তারা এই গ্রামের হতে যাবে কেন? তারা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, তা কেউ জানে না! তবে আমার চোখকে ওরা ফাঁকি দিতে পারে না। আমি সব বুঝি! হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ!"

মধু নিজের মাথার চারপাশে একটা আঙুল ঘুরিয়ে বোঝাল যে, লোকটির মাথা একেবারে খারাপ।

লোকটি হঠাৎ মাথা নিচু করে এক দৌড় লাগাল।

মধু বলল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই যে গাছগুলোকে সব উপড়ে ফেলেছে, এসব ঐ পাগল মুরশেদেরই কাণ্ড ! পাগল ছাড়া এমন দামি-দামি গাছ কে নষ্ট করবে বলুন ?"

দিপু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবারে সে বলল, "গাছের গোড়াগুলো অনেকখানি করে খোঁড়া হয়েছে। ওর কাছে শাবল-টাবল তো কিছু ছিল না !"

মধু বলল, "এখানে কোথাও শাবল লুকিয়ে রেখেছে হয়তো ! তা ছাড়া, ওর হাতের নোখ লক্ষ করেছেন, কত বড় ?"

ইরানি বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চল্, বাইরে যাই।"

ওরা লেবুবাগান থেকে বেরিয়ে আসবার পর ইরানি বলল, "এইরকমভাবে বাগানে যখন-তখন লোক ঢুকে আসতে পারে ? তা হলে তো সব লেবু চুরি হয়ে যেতে পারে !"

মধু বলল, "এমনিতে তো এদিকে কেউ চুরি-টুরি করতে আসে না। গাছে যখন লেবু ছিল তখন অবশ্য রাতে আমরা পাহারা দিয়েছি। কিন্তু পাগলকে কী করে আটকানো যায় বলুন। ও মাঝে-মাঝেই আসে। বড়বাবু ওকে পছন্দ করতেন। ঐ মুরশেদ আগে এখানকার প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার ছিল। তারপর হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। একেবারে যা-তা পাগল। ও নাকি দিন-দুপুরে ভূত দেখতে পায়, ভূতের সঙ্গে কথা বলে !"

ইরানি বলল, "আচ্ছা, ওর সম্পর্কে পরে শুনব। এখন তো একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয় !"

দিপু বলল, "তা হলে আজকের রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাব তো ?"

ইরানি বলল, "শুধু আজকের রাত্তির কেন ? আমরা জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ নিতে এসেছি। খোঁজ না নিয়ে ফিরব কী করে ?"

দিপু বলল, "তা হলে এক কাজ করা যাক। টেলিগ্রামে তো সব কথা লেখা যাবে না। বরং আমরা রঘুকে ফেরত পাঠিয়ে দিই। ও গিয়ে মাকে সব খুলে বলতে পারবে। তুই একা-একা যেতে পারবি না, রঘু ?"

রঘু মুখ গোঁজ করে বলল, "না, আমি যাব না !"

ইরানি হুকুমের সুরে বলল, "হ্যাঁ, তোকে যেতে হবে। দিপু ঠিকই বলেছে।"

রঘু বলল, "আমি একা গেলে হারিয়ে যাব !"

দিপু বলল, "অমনি চালাকি হচ্ছে ? তুই যে বলেছিলি, তুই তোর দেশের বাড়িতে একা-একা যেতে পারিস ট্রেনে চেপে ?"

রঘু বলল, "সে তো অন্য লাইন !"

ইরানি মধুকে বলল, "রান্না হয়েছে কি না দেখুন তো ! রঘুকে আগে খাইয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

রান্না তৈরি, সকলেই একসঙ্গে খেতে বসে গেল। গরম-গরম খিচুড়ি আর বেগুনভাজা আর ডিমের ঝোল। এককড়ি রাঁধে বেশ ভাল, কিন্তু মুখটা গোমড়া। দিপু আর ইরানিব এখানে থেকে যাওয়া যেন তার পছন্দ নয়। একবার সে বলেই ফেলল, "বড়বাবু নেই, তোমরা ছেলেমানুষ এখানে থাকবে, আবার যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয় !"

ইরানি বলল, "আপনি যত ছেলেমানুষ ভাবছেন, আমরা তত ছেলেমানুষ নই।"

এককড়ি ঠাকুর অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "হুঁঃ !"

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাওয়ার পর রঘুর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে. বুঝিয়েসুঝিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতার দিকে। তারপর ইরানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল কেষ্ট আর এককড়িকে।

দিপুর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। তার মাথাটা কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা লাগছে, কিছুতেই বুদ্ধি খুলছে না। ব্যাপারটা সে

বুঝতে পারছে না কিছুই। জ্যাঠামশাই হঠাৎ কোথায় চলে যেতে পারেন ? লেবুবাগানে পাগলটিকে দেখে দিপুর অতখানি ভুল হল কেন ? লোকটি কি সত্যিই পাগল ? কথা শুনে তো পাগলামির কোনো লক্ষণ বোঝা গেল না ?

বারান্দায় বসে দিপু একদৃষ্টে চেয়ে রইল আধ-ঝলসানো পেয়ারাবাগানটার দিকে। এরকম তাকিয়ে থাকতে থাকতে দিপু হঠাৎ কোনো দৃশ্য দেখতে পায়, যা অন্য কেউ দেখে না। কিন্তু এখন সে-রকম কিছুই হচ্ছে না।

আস্তে-আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল। তারপরই অসংখ্য ঝুমঝুমির মতন শোনা যেতে লাগল ঝিঁঝির ডাক। কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই বলে চারদিকে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এক সময় ইরানি এসে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, তুই এমন চুপ করে বসে আছিস ? কী ভাবছিস ?"

দিপু বলল, "ভাবছি, কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয় ?"

ইরানি অবাক হয়ে বলল, "কাকাবাবু ? কাকাবাবু আবার কে ? আমাদের তো কোনো কাকা নেই।"

দিপু বলল, "ধুত ! সে-কথা বলছি না। বলছি, সন্তুর কাকাবাবুর কথা। উনি কত কঠিন-কঠিন সব রহস্যের সমাধান করেছেন। কাকাবাবুকে যদি সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা যায়, তা হলে উনি এখানে আসবেন না ?"

॥ ৯ ॥

বাইরে একটা সাইকেলের বেলের ক্রিংক্রিং শব্দ শোনা গেল। তারপর কে যেন হাঁক দিল, "কেষ্ট ? কেষ্ট আছিস নাকি ?"

কেষ্ট কাছাকাছি বোধহয় নেই, সে উত্তর দিল না। ইরানি নেমে এল বারান্দা দিয়ে।

পুলিশের পোশাক পরা একজন লোক সাইকেল থেকে নেমে

দাঁড়িয়েছেন। বেশ মোটাসোটা চেহারা, মাঝারি বয়েস। হরতনের গোলামের মতন পুরুষ্টু একখানা গোঁফে ঠোঁট প্রায় ঢাকা। লোকটির ভুরু দুটোও বেশ মোটা-মোটা।

ইরানিকে দেখে বেশ অবাক হয়ে সেই মোটা ভুরু দুটো ধনুকের মতন বাঁকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে গো ? তোমায় তো আগে দেখিনি ?"

ইরানি বলল, "এটা আমার জ্যাঠামশাইয়ের ফার্ম। আমি আর আমার ভাই কলকাতা থেকে আজ দুপুরে এসেছি।"

এই সময় মধু রান্নাঘরের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "দারোগাবাবু এসেছেন ? বসুন, বসুন ! ওরে এককড়ি, একটা চেয়ার নিয়ে আয় !"

দিপু তার দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। এত কাছ থেকে কোনো পুলিশের লোককে সে আগে দেখেনি। দারোগাবাবুর চেহারা দেখে বেশ ভালমানুষ মনে হয়। দিপুর বড়মামার মুখখানা ঠিক এইরকম। তাদের পাড়ার দর্জি সুন্দর আলির চেহারার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। বড়মামা আর সুন্দর আলি, দু'জনেই ভাল লোক। এইরকম লোক কি চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করতে পারে ?

দারোগাবাবু মধুকে বললেন, "তোদের এখান থেকে নাকি একটা সাইকেল চুরি গেছে ? চালতাডাঙার হাটে তিনটে সাইকেল ধরা পড়েছে। থানায় গিয়ে দেখে আসিস তো তোদের সাইকেলটা ওর মধ্যে আছে নাকি ?"

এককড়ি একটা চেয়ার পেতে দিল দারোগাবাবুর জন্য। তারপর বলল, "আপনারা শুধু সাইকেল-চুরি-ই ধরতে পারেন। বড়বাবু যে কোথায় গেলেন, তার খোঁজ তো এখনও দিতে পারলেন না।"

দারোগাবাবু আবার অবাক হয়ে বললেন, "বড়বাবু ? কেন, তাঁর কী হয়েছে ?"

এবারে মধু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "আজ্ঞে, বড়বাবুকে যে কয়েকদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরে উঠে একলা-একলা বাইরে বেরোলেন, তারপর থেকেই..."

দারোগাবাবু বললেন, "সে কী ? উনি আবার কোথায় যাবেন ? কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ? আমায় কেউ খবর দেয়নি !"

মধু বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি থানায় জানিয়ে এসেছি, আপনি তখন ছিলেন না।"

দারোগাবাবু বললেন, "এ বড় আশ্চর্যের কথা। অত বড় মানুষটা এমনি-এমনি যাবেন কোথায় ? হঠাৎ কলকাতায় চলে যাননি তো ?"

মধু ইরানির দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "এই তো বড়বাবুর ভাইঝি এসেছে কলকাতা থেকে। এনারাও কোনো খবর জানেন না।"

দারোগাবাবু বললেন, "হয়তো কলকাতায় গেছেন অন্য কোনো কাজে। হোটেলে উঠেছেন।"

ইরানি বলল, "জ্যাঠামশাই কলকাতায় গেলে প্রথমে আমাদের বাড়িতেই আসেন। হোটেলে উঠবেন কেন ?"

এককড়ি বিদ্রূপের সুরে বলল, "যত সব উল্টোপাল্টা কথা ! বড়বাবু রাতদুপুরে কলকাতায় যাবেন কি উড়োজাহাজে ? সে সময়ে কি কোনো বাস আছে না ট্রেন আছে ? হুঁঃ !"

হঠাৎ দিপুর মনে হল, এই এককড়ি নামের লোকটি বোধহয় কিছু জানে। সব কথা সে খুলে বলছে না। লোকটির সাহসও আছে, নইলে দারোগাবাবুর সামনে এরকমভাবে কথা বলতে পারে ?

দারোগাবাবু এককড়ির কথা গায়ে মাখলেন না। মধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো চিঠি-ফিঠি লিখে যাননি ? তোকে সেদিন এমন কোনো কথাও বলেননি যে, হঠাৎ কোথাও যেতে হতে পারে ?"

মধু বলল, "সেদিন তো বড়বাবুর পায়ে চোট লেগেছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। রাত্তিরে শুয়ে পড়েছিলেন তাড়াতাড়ি।"

"তোদের একটাই তো মোটে সাইকেল ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উনি বেশি দূর তো হেঁটে যেতে পারবেন না ! পায়ে চোট লেগেছিল কী করে ?"

"আজ্ঞে তা জানি না। আমি একটু বাইরে গেসলুম, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে দেখি, বড়বাবু পুকুরঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তারপর ওনার জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু ভাল করে হাঁটতে পারছিলেন না।"

"অ্যাঁ ? এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না ?"

দিপু বলল, "এখানকার লেবুবাগানের আট-দশটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। জ্যাঠামশাই রাত্তিরে উঠে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন !"

দারোগাবাবু বললেন, "লেবুগাছ উপড়ে ফেলেছে ? কে এসব করেছে ? এমন ভালজাতের লেবু এ-তল্লাটে আর কোথাও হয় না !"

এককড়ি বলল, "বড়বাবু রোজ রাতেই লেবুবাগানের ধারে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। আমাকে বলেছিলেন, রাত্তিরে লেবুপাতার গন্ধ নিশ্বাসে নিলে মন ভাল থাকে। আমিও ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে বসে থাকি।"

দারোগাবাবু এবারে এককড়ির দিকে ফিরে বললেন, "সেই রাতেও গেস্‌লে ?"

এককড়ি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ !"

"তোমাদের বড়বাবুকে সেখানে দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ, তাও দেখেছি।"

"তারপর ?"

"কী তারপর ?"

"বড়বাবুকে দেখার পর তুমি কী করলে ? উনি কোথায় গেলেন তা দেখলে না ? ওনার সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে ?"

"না, কথা বলিনি। বড়বাবু ব্যস্ত ছিলেন।"

"ব্যস্ত ছিলেন মানে ?"

"বড়বাবু লেবুগাছগুলোর সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"গাছের সঙ্গে কথা বলছিলেন ?"

"হ্যাঁ ! অমন অবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন কী ? গাছের সঙ্গে বুঝি কথা বলা যায় না ? যারা পারে, তারাই বলে। আমিও আগে পারতাম, এখন ভুলে গেছি !"

দারোগাবাবু মধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই পাগলটাকে তোদের বড়বাবু একটা হাট থেকে ধরে এনেছিলেন না ?"

মধু কোনো উত্তর দিল না। এককড়ি বলল, "আমি পাগল ? হে হে হে ! তা হলে দুনিয়ায় আর ভাল রইল কে ? আমি সব সত্যি কথা বলি

কিনা, তাই লোকের কানে ব্যাঁকা-ব্যাঁকা শোনায়। যাক গে যাক, আপনি চা খাবেন তো ? চায়ের সাথে আর কী খাবেন, মুড়ি আর ডিমসেদ্ধ ?"

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ, কিচ্ছু খাব না ! পেটটা ভাল নেই। এসেছিলুম কয়েক গণ্ডা গন্ধলেবু নেবার জন্য। আছে নাকি রে ?"

মধু বলল, "লেবু তো সব বেচে দেওয়া হয়েছে। দুটো-একটা ঘরে আছে বোধহয়। এনে দেব ?"

দারোগাবাবু বললেন, "তাই দাও ! দেখি খোঁজখবর নিয়ে। অত বড় মানুষটা তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না !"

এককড়ি বলল, "তাও পারে ! কত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।"

দারোগাবাবু বললেন, "বটে ! শোনো হে, তুমি কাল সকালে আমার সঙ্গে একবার থানায় দেখা করবে !"

এবার এককড়ি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। মুখ শুকনো করে বলল, "আমি ? না না না, আমি থানা-টানায় যেতে পারব না ! ওসব জায়গায় যেতে আমার ভাল লাগে না !"

দারোগাবাবু বললেন, "নিজের থেকে যদি না যাও, তাহলে সেপাই পাঠিয়ে তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা কি ভাল লাগবে ? নিজেই চলে এসো, তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা আছে।"

তারপর ইরানির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি রাত্তিরে এখানেই থাকবে নাকি ?"

ইরানি বলল, "হ্যাঁ। জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ না পেলে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না !"

দারোগাবাবু বললেন, "সাবধানে থেকো ! দিনকাল ভাল নয়। চলি ! ওহে এককড়ি, কাল সকালে ঠিক এসো কিন্তু !"

সাইকেলের মুখটা ঘোরালেন দারোগাবাবু। তারপর অতবড় চেহারা নিয়েও বেশ টপ করে উঠে পড়লেন সাইকেলে।

এককড়ি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল দারোগাবাবুর উদ্দেশে।

মধু বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? দারোগাবাবু মানুষ ভাল, মারধোর

তো করবেন না। দেখা করতে বলেছেন, একবার ঘুরে এসো কাল সকালে।"

ইরানি আর দিপু উঠে এল বারান্দায়। সন্তুর কাকাবাবুকে দিপু চিঠি লেখা শুরু করেও শেষ করতে পারেনি। একটু পরে লিখলেও হবে। দিপু বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

হঠাৎ এই ঘরের, বারান্দার আর রান্নাঘরের সব ক'টা আলোই নিভে গেল একসঙ্গে। নিশ্চয়ই লোডশেডিং!

উঠোন থেকে মধু চেঁচিয়ে বলল, "একটু অপেক্ষা করো, আমি হারিকেন জ্বেলে দিচ্ছি!"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "এই দিপু, তুই টর্চ আনিসনি?"

দিপু বলল, "আমি কী জানি, তুমিই তো জিনিসপত্তর গুছিয়ে এনেছ!"

ইরানি বলল, "জ্যাঠামশাইয়ের নিশ্চয়ই টর্চ আছে। মধুদা এলে খুঁজে দেখতে হবে।"

দিপু টর্চের জন্য অপেক্ষা করল না। সে মনে-মনে ঠিকই করে ফেলেছে, রাত্তিরে সে একা-একা আর-একবার লেবুবাগানে যাবে। এখন অবশ্য বেশি রাত হয়নি, মাত্র সাতটা কি সাড়ে সাতটা বাজে।

সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরটার দিকে।

এককড়ি হারিকেন বা মোম জ্বালেনি। বসে আছে জ্বলন্ত উনুনের সামনে। আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। দিপুর পায়ের শব্দ পেতেই বেশ জোরে বলে উঠল, "কে? কে ওখানে?"

দিপু বলল, "আমি।"

এককড়ি কড়া গলায় বলল, "এখানে কী চাই? এর মধ্যে আবার খিদে পেয়ে গেছে নাকি? এখন কিছু হবে না!"

দিপু বিনীতভাবে বলল, "না, এককড়িদা, আমার খিদে পায়নি। এমনি তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলুম।"

"আমি গল্পটল্প কিছু জানি না! আমি মরছি নিজের জ্বালায়, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে উনপঞ্চাশ! হেঃ! আমায় নিয়ে টানাটানি!"

দিপু চুপ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকবাদে এককড়ি আবার বলল, "কী চাই আমার কাছে ? খুলেই বলো না !"

দিপু বলল, "এককড়িদা, তুমি রাত্তিরবেলা লেবুবাগানে যাও, আজ রাত্তিরে আমায় নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে ?"

এককড়ি বলল, "না ! আবার কী ঝঞ্ঝাট-টঞ্ঝাট হবে ! ওসবের মধ্যে আমি নেই।"

দিপু বলল, "আচ্ছা, তুমি যে বললে, জ্যাঠামশাই লেবুগাছগুলোর সঙ্গে কথা বলতেন ! কী কথা বলতেন, তুমি শুনেছিলে ?"

এককড়ি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি। সেদিন উনি লেবুগাছগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, ওগো, আমায় বলো না, আমার পেয়ারাবাগানটা কে পুড়িয়ে দিল ? তোমরা ঠিক জানো, তোমরা তো দেখেছ…"

এককড়ির কথার মাঝখানেই বাইরে কামানগর্জনের মতন প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। দিপু ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে দৌড়ে চলে এল এককড়ির কাছে।

এককড়ি বলল, "আবার কোথায় বাজ পড়ল। ক'দিন ধরেই দেখছি যখন-তখন মেঘ আর বৃষ্টি আর বজ্রপাত ! খুবই অলুক্ষুনে ব্যাপার। খুবই অলুক্ষুনে !"

॥ ১০ ॥

ঝমঝম করে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সত্যি, একটু আগে আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতও হচ্ছে ঘনঘন। রান্নাঘরের মধ্যে দিপু এককড়ির গা ঘেঁষে বসে রইল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মধ্যে বিদ্যুতের চমক আর বৃষ্টির শব্দ। কীরকম যেন গা-ছমছম করে। অথচ দিপু তো এমনিতে তেমন ভিতু নয়। ভয় পাচ্ছে বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে দিপুর।

এককড়ি উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াল। বাইরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে দিপুকে জিজ্ঞেস করল, "এই রকম অসময়ে ঘন ঘোর বৃষ্টি হয় কেন বলতে পারো ?"

দিপু এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন আগে কখনও শোনেনি, এর উত্তরও জানে না।

এককড়ি বলল, "ওরা চায় না এই সময় কেউ বাইরে বেরোক। এই সময় ওদের রাজত্ব চলে।"

দিপু বলল, "ওরা মানে? কারা?"

এককড়ি চোখ টিপে বলল, "সে তোমার না জানাই ভাল। ওদের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। যেমন আমাদের মুরশেদ-মাস্টারের অবস্থা হয়েছে।"

দিপু হেসে ফেলল। এককড়ি তাকে ভূতের ভয় দেখাতে চাইছে নাকি? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভূত বেরোয়, এরকম তো কোথাও লেখা নেই।

এককড়ি আবার বলল, "ঝড়বৃষ্টিতে কাদের বেশি সুবিধে হয় জানো? গাছগুলোর। তখন গাছগুলো ওদের সঙ্গে কথা বলে!"

দিপুর মনে হল, সত্যিই তা হলে পাগল। কথাবার্তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কিংবা ইচ্ছে করে এরকম পাগল সাজছে এককড়ি।

দিপু নিছক কথা চালাবার জন্যই বলল, "আচ্ছা এককড়িদাদা, তুমি তো গাছের ভাষা জানো..."

"আগে জানতুম, এখন ভুলে গেছি।"

"আগে তো কথা বলতে। তুমি গাছকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা কীভাবে উত্তর দেয়? গাছ কি শব্দ করতে পারে?"

"অদ্ভুত তোমার কথা! মানুষ বুঝি শব্দ না করে উত্তর দিতে পারে না? তুমি যে ইস্কুলে একজামিনের সময় প্রশ্নের উত্তর দাও, তখন কি তুমি শব্দ করো, না কাগজ-কলমে লেখো? গাছও তেমনি হাওয়ার ওপর ডালপালা দিয়ে লেখে। সেই সব দেখেশুনে বুঝে নিতে হয়।"

"আমার মনে হচ্ছে, ঐ লেবুবাগানটার মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে। ওখানেই সব কিছু ঘটছে।"

"ঠিক ধরেছ। ঐ লেবুগাছগুলোই যত নষ্টের গোড়া। এমন নচ্ছার লেবুর জাত আমি বাপের জন্মে দেখিনি। ওরাই তো বড়বাবুকে রোজ উত্ত্যক্ত করে মারত।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি ! এসব আমার নিজের চোখে দেখা কিনা ! তবে তোমাকে যা বলছি বলছি, থানার দারোগাকে আমি কিছুই বলব না। সে আমাকে মারুক, ধরুক, যাই-ই করুক।"

"কয়েকটা লেবুগাছ ওখানে উপড়ে ফেলল কে, তাও জানো ?"

এবারে একগাল হেসে এককড়ি বলল, "তা আর জানব না। হে হে হে ! আমি নিজেই যে ব্যাটাদের শাস্তি দিয়েছি !"

"তুমি ? মানে, তুমি অত ভাল-ভাল গাছ..."

"মোটেই ভাল নয়। ওরা বজ্জাত। মানুষের মধ্যে যেমন হয়, তেমনি গাছের মধ্যেও কোনো-কোনোটা খুব পাজি থাকে। বড়বাবুও সে-কথা জানতেন। তুমি একটা জিনিস দেখতে চাও, তোমার সাহস আছে ?"

"হ্যাঁ, বলো, কী দেখাবে ?"

"বৃষ্টি ভিজতে পারবে ?"

"খুব জোর বৃষ্টি পড়ছে যে ?"

"এই তো ! পারবে না জানতুম। এই বৃষ্টির মধ্যে বেরুতে আমি ভয় পাই না। আমি আধপাগলা তো, তাই আমার পুরো পাগল হয়ে যাবার ভয় নেই। থাক বাবা, তোমার গিয়ে কাজ নেই।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"ঐ লেবুবাগানে !"

"চলো তা হলে।"

"তা হলে এক কাজ করো। আমার টর্চটা দিচ্ছি, ওটা তুমি হাতে নাও। আর এই আলুর বস্তাটা মাথায় দিয়ে নাও, তাতে কম ভিজবে।"

সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল দুজনে। দিপুর খালি একটাই চিন্তা, মাথায় না বাজ পড়ে। মাথায় বাজ পড়লে নাকি মানুষ একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঐ পেয়ারাগাছগুলোরই তো কী অবস্থা হয়েছে !

এককড়ি বলল, "শোনো, আমি যখন বলব, তখনই শুধু টর্চ জ্বালবে, তার আগে নয়।"

ওরা এসে দাঁড়াল লেবুবাগানের ধারে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে যেন বিঁধে যাচ্ছে। এককড়ি দিপুর হাত টিপে ফিসফিস করে বলল, "শোনো, শব্দ

কোরো না, কেউ যেন টের না পায় আমরা এখানে আছি।"

সেইরকমভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। মাথায় আলুর বস্তা দিয়েও বিশেষ কিছু সুবিধে হয়নি, দিপু একেবারে জবজবে ভিজে গেছে।

দিপু ভাবল, এখানে কিছুই ঘটবে না। শুধু-শুধু একটা পাগলের পাল্লায় পড়ে সে এখানে বৃষ্টিতে ভিজছে। দিদি নিশ্চয়ই এতক্ষণ খোঁজ করছে তার।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা অতিকায় সাপের মতন বিদ্যুৎ খেলে গেল। নীল রঙের আলোয় যেন চোখ ঝলসে যায়।

সেই এক পলকের আলোতেই দিপু দেখল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। অতগুলো লেবুগাছের মধ্যে মাত্র তিন-চারটে লেবুগাছ দারুণভাবে নড়ছে। ঠিক যেন সব ডাল-পাতা কাঁপিয়ে শুরু করেছে একটা নাচ। অবিকল মানুষের মতন। বাকি সব গাছ একেবারে শান্ত।

পরের মুহূর্তেই আবার অন্ধকার।

এককড়ি বলে উঠল, "জ্বালো! এবারে জ্বালো!"

দিপু শুনতে পেল না। তার চোখে ঘোর লেগে গেছে।

এককড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "কী হল? টর্চ জ্বালো! শিগগির জ্বালো!"

দিপু বলল, "অ্যাঁ, কী বলছ?"

ওর হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে নিজেই জ্বালল এককড়ি।

এবারে কিছুই দেখা গেল না। সব স্বাভাবিক। ওদেরই মতন সব ক'টা লেবুগাছ শান্তভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজছে। কয়েক মুহূর্ত আগে ওদের মধ্যে তিন-চারটি যে প্রবলভাবে নাচ শুরু করেছিল, তার কোনো চিহ্নই নেই।

এককড়ি বলল, "যাঃ, এখন আর কিছু নেই। যখন দেখবার, তখন তো দেখতে পেলে না!"

দিপু এখনও চুপ করে রয়েছে। কোনো কথা বলতে পারছে না। যা দেখল একটু আগে, তার মানে কী? গাছগুলো কেন ওই রকম করছিল? কেনই বা থেমে গেল?

এককড়ি বলল, "চলো, আর কিছু দেখা যাবে না। ভালই হয়েছে, দেখলে তুমি তখন কী করে বসতে!"

দিপুর মনে হল, বাতাসে বোধহয় নানারকম পর্দা আছে। এক-এক সময় তার এক-একটা পর্দা সরে যায়, অমনি অন্যরকম কিছু একটা বেরিয়ে পড়ে।

আবার কি বিদ্যুৎ চমকাবে না? আবার কিছু দেখা যাবে না?

এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই আর-একবার বিদ্যুতের আলোয় চিরে গেল আকাশ। কিন্তু এবারে কিছুই দেখা গেল না। অন্ধকারেও যে-রকম. আলোতেও গাছগুলো সেই একই।

তবু দিপুর জেদ চেপে গেছে।

সে বলল, "এককড়িদা, তুমি ফিরে যাও, আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকব।"

এককড়ি বলল, "তা হয় না, বাছা! তোমাকে কি আমি একা ফেলে যেতে পারি? এসব বড় বিপদের জিনিস।"

"এককড়িদা, তুমি কী দেখার কথা বলছিলে? ঐ যে তিন-চারটে গাছ আলাদাভাবে নাচছিল, সেই কথা?"

"তুমি সেটা দেখেছ? ঐ গাছগুলো যাদের সঙ্গে কথা বলছিল, তাদের দেখতে পাওনি?"

"কাদের সঙ্গে কথা বলছিল?"

"তারাই তো আসল! তারা চট করে দেখা দেয় না। অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আর বোঝবার দরকার নেই। চলো তো!"

দূর থেকে ইরানির ডাক শোনা যাচ্ছে, "দিপু! এই দিপু!"

সে-ডাক যেন কত দূরে। দিপুর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

যেমন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

যে তিন-চারটে গাছ অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছিল, দিপু তাদের চিনে রেখেছে। সেদিক থেকে একবারও চোখ সরায়নি।

এবার তার মাথায় একটা ঝোঁক চেপে গেল। সে দৌড়ে লেবুবাগানের মধ্যে ঢুকে তারই একটা গাছকে ধরে পরীক্ষা করতে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে দিপু ছিটকে পড়ল মাটিতে।

॥ ১১ ॥

ইরানির বৃষ্টি খুব খারাপ লাগে। বিশেষত কলকাতার বাইরে কোথাও গেলে। ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। বাইরে এমন অন্ধকার যে বৃষ্টিও দেখা যায় না।

ইরানি আজ সারাদিনের ঘটনা ভাবল। এক দিনের মধ্যে কত কী কাণ্ড হল। দেখা হল কতরকম মানুষের সঙ্গে। কলকাতায় থাকলে দিনের পর দিন নতুন কোনো লোকের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না। আর আজ ট্রেনের সেই লোকটা, যে ডাকাতদের রিভলভারটা নিয়ে চলে গেল! যাবার সময় বলে গেল, আবার দেখা হবে! আশ্চর্য ব্যাপার।

খানিকটা আগে পুলিশের যে দারোগাটি এসেছিলেন, তিনিও কীরকম যেন অদ্ভুত ধরনের। হঠাৎ কেন এককড়ির ওপর রেগে গেলেন? অবশ্য এককড়ির মতন পাগলাটে মানুষও ইরানি আগে দেখেনি।

জ্যাঠামশাই কোথায় চলে গেলেন তা ইরানি কিছুই বুঝতে পারছে না। এখানকার লোকেরাও কেমন যেন উল্টোপাল্টা কথা বলছে। বাজ পড়ে পেয়ারাবাগানটা অনেকটা পুড়ে গেছে, লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। এর সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক?

ইরানি ভেবেচিন্তে দেখল, জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ করার ব্যাপারে সে আর দিপু কিছু করতে পারবে না। গল্পের বইতে শখের ডিটেকটিভরা কত সব রহস্যের সমাধান করে ফেলে। ইরানি নিজেও ভেবেছিল, এখানে এসে অনেক ক্লু পেয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, এ-সব কাজ সহজ নয়।

কাল সকালেই চলে যেতে হবে এখান থেকে। জ্যাঠামশাইয়ের খবর নিতে আসা হয়েছিল, খবর এটাই পাওয়া গেল যে, জ্যাঠামশাইয়ের কোনো খবর নেই। এখন বাবা যা হোক ব্যবস্থা করবেন। বিকেল পর্যন্তও ইরানির

ইচ্ছে ছিল, এখানে কয়েকদিন থেকে গিয়ে যে-করেই হোক জ্যাঠামশাইকে খুঁজে বার করে তারপর ফিরবে কলকাতায়। কিন্তু রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা বসে থেকে সে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারল যে, এইরকম গ্রামে তাদের মতন শহুরে ছেলে-মেয়েরা এসে কোনোরকম সুবিধে করতে পারবে না।

দিপু কোথায় গেল? মধুদাকেও কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে আর-কোনো শব্দ নেই, শুধু কোঁয়াও কোঁয়াও করে মোটা-মোটা ব্যাঙদের ডাক শোনা যাচ্ছে। এত ব্যাঙ ধারেকাছেই আছে নাকি? ব্যাঙ থাকলেই নাকি সাপ থাকে।

ইরানি বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল, তার একটুও ভাল লাগছে না। খাওয়া-টাওয়া সেরে নিয়ে এখন শুয়ে পড়লেই হয়!

একবার বিদ্যুৎ চমকের পর প্রচণ্ড জোরে বাজের শব্দ হল। ইরানি পিছিয়ে এল কয়েক পা। বাজের শব্দে বুকটা কেঁপে ওঠে। পৃথিবীতে যত শব্দ আছে, তার মধ্যে বাজের শব্দটাই বোধহয় সবচেয়ে জোরে। কিংবা অ্যাটম বোমের শব্দ কি আরও জোরে?

একটু পরেই হঠাৎ বৃষ্টি থামল আর আকাশ থেকেও মেঘ কেটে গেল অনেকটা।

ইরানি ডাকল, "দিপু, দিপু!"

কোনো সাড়া নেই।

বৃষ্টি থেমে যাবার পর বাইরেটা আর তেমন অন্ধকার লাগছে না। ইরানি উঠোনে নেমে এসে আবার ডাকল, " মধুদা ! দিপু!"

এবারেও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কী ব্যাপার, এরা সব গেল কোথায়?

একটু দূরে রান্নাঘরের আলোটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইরানি এগিয়ে গেল সেদিকে।

কয়েক পা যেতেই পুঁ-উ-উ-উ করে একটা শব্দ হতে লাগল। খুব কাছেই। ইরানি প্রথমে বুঝতে পারল না শব্দটা কিসের। তারপর দেখল একটা পোকা ঐ রকম শব্দ করে তার মুখের চারপাশে ঘুরছে।

ইরানি ভয়ে মুখটা চাপা দিল দু'হাতে। পোকা-টোকা সে দু'চক্ষে

দেখতে পারে না। কোথায় কুট করে কামড়ে দেবে আর অমনি ঘা হয়ে যাবে !

পোকাটা কিন্তু তীক্ষ্ণ শব্দ করে ঘুরতেই লাগল তার মুখের চারদিকে। ইরানিকে কামড়াল না।

একটু পরেই ইরানি টের পেল, কী যেন জড়িয়ে যাচ্ছে তার হাতে। সুতোর মতন।

ইরানি মুখ থেকে হাতটা সরাতে গিয়ে দেখল, মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম অসংখ্য সুতো তার হাত আর মুখ জড়িয়ে ফেলেছে। সুতোগুলো কিন্তু শক্ত নয়। ইরানি জোরে জোরে হাত নাড়তেই সেগুলো ছিঁড়ে যেতে লাগল।

পোকাটাই ঘুরে-ঘুরে ঐ সুতো বুনে চলেছে।

ইরানি বেপরোয়া হয়ে গিয়ে এক দৌড় মারল রান্নাঘরের দিকে।

পোকাটা কিন্তু ইরানিকে তেড়ে এল না। আপাতত নিরীহই মনে হয়। পুঁ-উ-উ-উ শব্দ করে উড়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইরানি হাঁপাতে লাগল। এ কী অদ্ভুত পোকা রে বাবা ! মাকড়সার মুখ দিয়ে এ-রকম সুতো বেরোয় সে জানে। কিন্তু কোনো পোকার মুখ দিয়ে যে সুতো বেরোয় সে-কথা সে কোনোদিন শোনেনি !

রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, সেখানে কেউ নেই। তার খুব রাগ হয়ে গেল। দিপুটা বড্ড অবাধ্য হয়েছে। তাকে একা-একা ফেলে কোথায় চলে গেল ? ইরানি যে তার গার্জেন হয়ে এসেছে, সে-কথা দিপু মানতেই চায় না !

রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে সে আবার বেশ জোরে "দিপু, দিপু" বলে ডাকল।

এবারে খানিকটা দূর থেকে এককড়ি বলল, "ও দিদি, এখানে এসো, শিগগির এসো !"

লেবুবাগানের দিকে ঝলসে উঠল একটা টর্চের আলো।

পোকাটা এখনো ঘোরাঘুরি করছে কিনা সেজন্য ইরানি একটু ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু এককড়ির গলার আওয়াজের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল

যাতে সে ভয়টা তার তক্ষুনি চলে গেল।

সে দৌড়োল লেবুবাগানের দিকে।

সেখানে গিয়ে সে আবার দারুণ চমকে উঠল। দিপু মাটিতে এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে যে, দেখলেই ভয় করে। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে মনে হয়।

এককড়ি দিপুকে সাহায্য করবার কোনো চেষ্টাই করছে না। একটা বাঁশ দিয়ে লেবুগাছগুলোকে মারছে আর দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলছে।

ইরানি ছুটে গিয়ে দিপুর পাশে বসে পড়ে তার নাকের কাছে হাত দিল নিশ্বাস পড়ছে। দিপুর গা গরম। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই

ইরানি তার গা ধরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল। "দিপু! দিপু!"

তিন চারবার ডাকবার পর দিপু সাড়া দিল, "উঁ!"

"এই দিপু! তোর কী হয়েছে? কোথায় লেগেছে?"

দিপু আস্তে-আস্তে চোখ মেলল। তারপর বলল, "কী হয়েছে? আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?"

"আমিও তা তাই জিজ্ঞেস করছি। কী হয়েছিল তোর মনে নেই?"

"না তো!"

ইরানি মুখ তুলে কড়া গলায় এককড়িকে বলল, "আপনি ও-সব কী করছেন? গাছগুলো নষ্ট করছেন কেন? দিপুর কী হয়েছিল?"

এককড়ি বাঁশপেটা করতে করতে দুটো বেশ শক্ত লেবুগাছকে একেবারে শুইয়ে ফেলেছে। তার ওপর আরও মারতে মারতে বলল, "তুমি জানো না দিদি! এরা সাংঘাতিক বদমাস! অতিশয় পাজি! হিংসুটে আর কুচুটে। এবারে এদের ঝাড়েবংশে নির্বংশ করব!"

"কী বাজে কথা বলছেন! দিপুর কী হয়েছে তাই বলুন!"

"এই গাছগুলো ছেলেটাকে মেরেছে। আর একটু হলে মেরেই ফেলত, আমি যদি কাছে না থাকতুম।"

"আবার বাজে কথা! গাছ কারুকে মারতে পারে? আপনি ওকে মেরেছেন নিশ্চয়ই!"

"আমি? বারে বা, বারে বা! আমি আছি বলে ছেলেটা বেঁচে গেল!"

দিপু এর মধ্যে উঠে বসেছে। গায়ের জামা একেবারে জলকাদায় মাখামাখি। মাথার চুলেও কাদা লেগেছে।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "তোর কোথায় লেগেছে রে ? কেউ তোকে মেরেছে ?"

দিপু বলল, "কী জানি, মনে পড়ছে না তো ! না, কোথাও লাগেনি। আমার কী হয়েছিল ?"

"তুই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি !"

"তাই ? এমনি এমনি অজ্ঞান হয়ে গেলুম ?"

"বোধহয় আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলি। তুই বৃষ্টির মধ্যে একা-একা বেরিয়েছিলি কেন ?"

"ঐ যে এককড়িদা বলল, আমায় কী যেন দেখাবে।"

ইরানি এককড়ির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। তার দৃঢ় ধারণা হল ঐ এককড়িও একজন বদ্ধ পাগল। জ্যাঠামশাই কোনো এক হাট থেকে ওকে ধরে এনেছিলেন। এখানে কতজন পাগল আছে কে জানে !

দিপুর হাত ধরে সে বলল, "চল, ঘরে চল ! কালই আমরা এখান থেকে চলে যাব !"

দিপু কোনো আপত্তি করল না। দিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

এককড়ি গজগজ করে বলল, "বা রে বা ! আমার ওপরে দোষ। আমি ছেলেটাকে বললাম, তুমি সহ্য করতে পারবে না ! এ-সব জিনিস নিয়ে কারবার করা কচিকাঁচাদের কাজ নয়। আমি নিজেই সব সময় তাল সামলাতে পারি না।"

ঘরে ফিরে এসে ইরানি বলল, "চান করে জামা-প্যান্ট বদলে নে। বৃষ্টির মধ্যে তুই কেন গিয়েছিলি ঐ লেবুবাগানে ?"

দিপু কোনো উত্তর না দিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

খানিক বাদে বেরিয়ে আসার পরেও সে চুপচাপ। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "তোর শরীর খারাপ লাগছে ?"

দিপু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

"খিদে পেয়েছে, কিছু খাবি ?"

"না।"

অনেকক্ষণ বাদে কেষ্ট এসে হাজির হয়ে বলল, "কী হয়েছিল খোকাবাবু নাকি আছাড় খেয়েছে ?"

ইরানি বলল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"।

কেষ্ট বলল, "গিয়েছিলুম একটু গ্রামের দিকে। খাবার-দাবার তো বিশেষ কিছু নেই।"

ইরানি বলল, "আমরা রাত্তিরে আর বিশেষ কিছু খাব না। দু'গেলাস দুধ এনে দিতে পারবে ?"

কেষ্ট চলে গেল দুধ আনতে।

সেই দুধ খেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল একটু বাদেই। ইরানি দরজা বন্ধ করে দিল নিজের হাতে। কেষ্ট নামের ছেলেটি বাইরের বারান্দায় শোবে।

মধ্যরাত পার হয়ে যাবার পর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আস্তে আস্তে উঠে বসল দিপু। ইরানি জেগে আছে কি না তা একটুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখল। ইরানির সমানভাবে নিশ্বাস পড়ছে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে দিপু বেরিয়ে এল বাইরে। কেষ্টকে পাশ কাটিয়ে সে উঠোনে নেমে পড়ল।

॥ ১২ ॥

দিপুকে যেন কেউ ডাকছে, তার না গেলে চলবে না।

দিদিকে কিছু বলার উপায় নেই, তাহলেই দিদি বারণ করবে। কিন্তু দিপু এখন বুঝতে পেরেছে, ঐ লেবুবাগানের মধ্যেই কিছু রহস্য আছে।

দিপু বাইরের উঠোনে পা দিতেই তার মুখের উপর একটা গোলমতন আলো পড়ল। ঠিক টর্চের আলো নয়, অন্য ধরনের আলো।

দিপু ফিসফিস করে বলল, "যাচ্ছি !"

আলোটা তার সামনে পথ দেখাতে লাগল, দিপু সেই দিকেই চলতে লাগল এমনভাবে যেন সে ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

আলোটা তার সামনে, কিন্তু দিপুর পিছনে একটা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দিপু পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও।

এত রাত্রে এখানে একজনও জেগে নেই। এখানে কেউ পাহারাও দেয় না। তবে দূরের রাস্তায় একটা গোরুর গাড়ি চলার কচরমচর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দুলছে তার লণ্ঠনের আলো।

আলোটা কিন্তু দিপুকে লেবুবাগানের দিকে নিয়ে গেল না। দিপুকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাগানের বাইরে পুকুরটার দিকে।

পুকুরের ঘাটের পাশে একটা আগাছার ঝোপ। আলোটা দিপুর সামনে থেকে সরে গিয়ে ঝোপটার ওপর পড়তেই হুড়মুড় করে তার ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল।

লোকটা একটা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে আছে। গা'টা তেল-চকচকে। চোখের চঞ্চল দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় তার মতলব খারাপ।

দিপু কিন্তু লোকটাকে দেখে একটুও ভয় পেল না। শুধু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখের দৃষ্টি স্থির।

লোকটা আলো দেখেই বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু দিপুর হাতে টর্চ বা অন্য কিছু নেই দেখে বেশ অবাক। আলোটা ক্রমশ জোরালো হয়ে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে ?"

লোকটা বলল, "আমি···ইয়ে···এখানে একজনকে খুঁজতে এসেছি !"

"কাকে খুঁজতে এসেছ ?"

"সে-কথা তোমাকে বলব কেন ? তুমি কে হে ? এদিক পানে তো আগে তোমায় দেখিনি !"

"আমার কথার উত্তর দাও !"

দিপুর গলায় রীতিমতন ধমকের সুর। লোকটার চেহারা বেশ বড়সড়, দিপুর মতন ছেলেকে তুলে আছাড় মারতে পারে। সে দিপুর ওরকম ভারিক্কিপনা দেখে চটে গেল বেশ।

সে বলল, "তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও তো খোকা। বেশি ফটর-ফটর কোরো না। আমার গোরু হারিয়েছে, গোরু খুঁজতে বেরিয়েছি।"

দিপু বলল, "মিথ্যে কথা। তুমি একটা চোর। রাত্তিরবেলা তুমি গায়ে তেল মুখে চুরি করতে বেরোও।"

“বেশ করি। চুরি করি তো তাতে তোমার কী ?”

“তুমি আমার সময় নষ্ট করছ। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও !”

“এঃ ! এইটুকুনি ছেলের তেজ কী ? আমারে তুমি চেনো না...”

দিপু রাগ করে বলল, “তোমাকে আমি চিনতেও চাই না। যাও !”

লোকটি বলল, “তবে রে, আমার ওপর চোটপাট ? দেখবি ?”

লোকটির কোমরে একটা ধান-কাটা কাস্তে গোঁজা। সেটা তুলে সে দিপুকে মারতে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আকাশে চড়াৎ করে একটা বিদ্যুৎ খেলে যাওয়ার পরেই বজ্রপাতের আওয়াজ হল। আর তাতে তার হাতের কাস্তেটা জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

লোকটা ‘ওরে বাবা রে, মা রে’ বলেই দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

অমনি ঝরঝর করে বৃষ্টি নামল। মাত্র অল্প খানিকটা জায়গা জুড়ে সেই বৃষ্টি।

দিপু সেই বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

মাত্র মিনিটখানেক পরেই থেমে গেল সেই বৃষ্টি। গায়ে তেল-মাখা লোকটা আস্তে-আস্তে উঠে বসে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল, “আমার কী হয়েছে ?”

দিপু বলল, “কিচ্ছু হয়নি, তুমি বাড়ি যাও !”

লোকটা বসে-থাকা অবস্থাতেই এমনভাবে দৌড় লাগাল যে, ঠিক মনে হল কোনো ওরাং-উটাং !

দিপুর ঠোঁটে ফুটে উঠল পাতলা হাসি। একটা চোরকে জব্দ করতে পেরে সে বেশ খুশি হয়েছে।

কী করে যে ঠিক সময়ে বজ্রপাত হল আর রহস্যময়ভাবে সামান্য একটু জায়গায় মোটে বৃষ্টি হল, সে সম্পর্কে দিপুর কোনো কৌতূহল নেই।

এবারে সে পুকুরের ঘাটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে, হাতজোড় করে বলল, “নমস্কার !”

দিপু আর ইরানি যখন প্রথম এসেছিল এখানে, তখন পুকুরটা ছিল প্রায় শুকনো। আজ সারা সন্ধে বৃষ্টির জন্যই বোধহয় এখন পুকুরটা জলে ভর্তি হয়ে একেবারে টইটম্বুর।

জলের দিকে পেছন ফিরে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। টুকটুকে ফর্সা রং, মাথায় একটাও চুল নেই, ঠিক ডিমের মতন মাথা। লোকটি বেশি লম্বা নয়। গায়ে একটা আলখাল্লার মতন জামা। মুখখানা হাসি-হাসি।

আলোটা এখন সেই লোকটিকে ঘিরে আছে।

লোকটি বেশ কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকভাবে দেখল দিপুকে। যেন সে দৃষ্টি দিয়ে দিপুর মনের ভেতরটা পর্যন্ত পরীক্ষা করছে।

তারপর সে যেন বেশ খুশি হল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি ভয় পাওনি আমায় দেখে, তাই না?"

দিপু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

লোকটি বলল, "আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তবু অনেকে ভয় পায়। তুমি সাধারণ ছেলেদের মত নও। তুমি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাও, তাই না?"

দিপু বলল, "মাঝে-মাঝে পাই!"

লোকটি একবার ডান দিকে চকিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমায় আগে কখনও দেখতে পেয়েছ?"

দিপু বলল, "না।"

মাথায় চুল নেই, আর অত ফর্সা রং বলেই লোকটির ভুরু দুটো যেন বেশি কালো মিশমিশে মনে হয়। লোকটির কথার উচ্চারণ শুনলে মনে হয় কোনো অবাঙালি বাংলা শিখেছে। কিন্তু বাংলা কথায় কোনো ভুল নেই।

লোকটি দিপুর 'না' শুনে বেশ অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, "তুমি আমায় আগে কখনও দেখনি? তবু আমি ডাকতেই তুমি এত রাত্তিরে চলে এলে? সত্যি তোমার সাহস আছে বলতে হবে!"

তারপর লোকটি আবার ডান দিকে তাকিয়ে বলল, "এঃ, আবার বিরক্ত করতে আসছে। আমার হাতে সময় খুব কম। ঐ চোরটা খানিকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল!"

দিপু ডানদিকে তাকিয়ে দেখল একটা কুকুর ছুটে আসছে তাদের দিকে।

কাছে এসে কুকুরটা বিরাট জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

দিপু কুকুর ভালবাসে। লোকটি আলখাল্লার ভেতর থেকে তার একটা হাত বার করতেই দিপু বলে উঠল, "ওকে মারবেন না!"

লোকটি বলল, "না, মারব কেন ? আমি কারুকেই মারি না। ওকে শুধু চুপ করিয়ে দিচ্ছি।"

সত্যি, সঙ্গে-সঙ্গে ডাক থেমে গেল কুকুরটার। সে লেজ গুটিয়ে পেছন দিকে দৌড় মারল।

লোকটি বলল, "আমার হাতে বেশি সময় নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না। তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে ?"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ?"

লোকটি বলল, "সে-জায়গার তো কোনো নাম নেই। সে-জায়গাটা কোথায় তাও তোমাকে বোঝাতে পারব না। যেতে চাও তো আমি নিয়ে যেতে পারি। তবে ফিরে আসাটা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। তুমি যদি নিজে আসতে না চাও, তা হলে কিন্তু কেউ তোমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব, আবার ফিরেও আসব। তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কয়েকটা লেবুগাছ ওরকম ব্যবহার করছে কেন ? তখন একটা লেবুগাছ আমাকে মারল। ঠিক মানুষের মতন। কোনো গাছ তো ওরকম করে না। ঠিক যেন হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিল আমাকে!"

লোকটি বলল, "বলব, বলব, সব বলব ! আগে চলো আমার সঙ্গে।"

"চলুন !"

লোকটি এবারে এসে দিপুর কাঁধ ছুঁয়ে বলল, "তুমি এতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ছিলে। এখন জাগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।"

দিপুর সারা শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল। একবার চোখ বুজে তারপরই আবার চোখ মেলে তাকাল।

লোকটি মৃদু-মৃদু হাসছে।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ? আপনি…আপনি…"

লোকটি বলল, "তুমি এই মাত্র যে স্বপ্ন দেখলে, তা কি তোমার মনে

আছে ?"

দিপু বলল, "হ্যাঁ। আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু আপনি আমায় কোথায় যেন নিয়ে যেতে চাইলেন।"

"তুমি এখনও যেতে চাও আমার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে চলো !"

লোকটি তার আলখাল্লার খানিকটা অংশ জড়িয়ে দিল দিপুর গায়ে।

॥ ১৩ ॥

ইরানির ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার মুখে, তবু সে পাশ ফিরে শুচ্ছে। সকালবেলা মা ডাকাডাকি না করলে সে উঠতেই চায় না। সে যে নতুন জায়গায় এসেছে, সে-কথা তার মনে নেই। ইরানি আজও ভাবছে, মা তো তাড়া লাগাবেই, তার আগে উঠে কী হবে ?

বেলা বেশ বাড়বার পর এক সময় কেষ্ট বাইরে থেকে ডেকে বলল, "ও দিদিমণি, উঠবে না ? তোমরা কি দুধ খাবে, না চা খাওয়ার অভ্যেস আছে ?"

দু'তিনবার এ-রকম ডাকাডাকির পর ইরানি বুঝতে পারল, এটা তাদের বাড়ি নয়, এটা বর্ধমানে জ্যাঠামশাইয়ের গ্রাম।

ইরানি চোখ না খুলেই বলল, "এই দিপু, দরজা খুলে দে ! বল আমার দুধ খাব।"

দিপুর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ইরানি চোখ খুলে তাকাল। পাশের বিছানায় দিপু নেই।

তাতে সে চিন্তিত হল না। দিপু রোজই তার থেকে আগে ওঠে। কলকাতায় দিপু ভোরে সাঁতার কাটতে যায়। বৃষ্টির দিনে ছাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইরানি তাকিয়ে দেখল দরজার ছিটকিনি খোলা।

একটু শীত-শীত লাগছে, ইরানি বিছানা থেকে উঠে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিল। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে বলল, "কেষ্ট, আমরা চা

খাই না। গরম দুধ খেতে পারি। দিপু কোথায় ?”

কেষ্ট বলল, “দেখিনি তো। ঘরে নেই ?”

ইরানি বলল, “না। গেছে কোথাও ঘুরতে !”

কেষ্ট বলল, “তোমাদের পুকুরঘাটে যেতে হবে না। বাথরুমে জল তুলে দিয়েছি, ওখানেই মুখ-টুখ ধুয়ে নাও।”

ইরানি বলল, “আমার দুধে চিনি দিও না। আমি মিষ্টি দুধ খেতে পারি না !”

কেষ্ট বেশ অবাক হল। মিষ্টি ছাড়া দুধ আবাব কেউ খেতে পারে নাকি ? কলকাতার মেয়েদের ধরন-ধারণই আলাদা !”

ইরানি বাথরুমে এসে দেখল দিপুর টুথ-ব্রাশ শুকনো। মুখ-টুখ না ধুয়েই কোথায় গেল ছেলেটা ?

দাঁত মাজতে মাজতেই ইরানি ঠিক করে ফেলল, এখানে থাকবার আর কোনো মানে হয় না। যত তাড়তাড়ি সম্ভব কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়বে।

একটি কচি-কলাপাতা-রঙের ফ্রক পরে একেবারে কলকাতার যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল ইরানি।

দুটো বেশ বড় এনামেলের মগ ভর্তি দুধ নিয়ে হাজির হল এককড়ি। খুব গরম দুধ, তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

এককড়ি একগাল হেসে বলল, “তোমবা শুনলুম দুধে মিষ্টি খাও না ? তা হলে কি নুন দেব ?”

এ-সব রসিকতা শোনার মত মেজাজ নেই এখন ইরানির। সে কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একটা মগ হাত বাড়িয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, “দিপু কোথায় ? তাকে ডাকুন।”

এককড়ি বলল, “তাকে তো আমি দেখিনি।”

একটা কাঁসার থালায় অনেকখানি মুড়ি আর কয়েকটা মর্তমান কলা হাতে নিয়ে এসে কেষ্ট বলল, “কই, তাকে তো খুঁজে পেলুম না। নেবুতলা, পেয়ারাবাগান, পুকুরধার, কোথাও তো সে নেই !”

ইরানি ভুরু কুঁচকে বলল, “নেই ? কোথায় গেল দিপু ?”

দিপুটা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু ইরানিকে না জানিয়ে সে

তো বেশি দূরে যাবে না।

এককড়ি হঠাৎ বলল, "মাঝরাত্তিরে বেরোয়নি তো আবার ? আমার সন্দেহ হচ্ছে..."

ইরানি মুখ তুলে বলল, "তার মানে ? কী সন্দেহ হচ্ছে ?"

এককড়ি বলল, "দ্যাখো দিদিমণি, তোমার ঐ ভাইটি বড় সহজ নয়। বেশ ডাকাবুকো, একেবারে ভয়ডর নেই।"

ইরানি বলল, "এখানে ভয় পাবার কী আছে ?"

এককড়ি দু'দিকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, "আছে, আছে, আছে ! তাই তো আমি নিশুতি রাতে বেরোই না।"

কেষ্ট তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুমি থামো তো ! আমি দেখছি খোকাবাবু কোথায় গেল !"

দুধের মগটা নামিয়ে রেখে ইরানি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "নিশ্চয়ই লেবুবাগানে ঢুকে বসে আছে। চলুন, আমি গিয়ে দেখছি।"

আজ আকাশে একটু মেঘ নেই, সুন্দর রোদ ঝলমল করছে। শোনা যাচ্ছে পাখির ডাক। এরকম একটা সকালবেলা কোনোরকম বিপদ বা ভয়ের কথা কল্পনা করাই যায় না।

ইরানি ভাবল, দিপুর মাথায় প্রায়ই ডিটেকটিভ সাজার শখ চাপে। কোথাও একটা পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা আধখানা পায়ের ছাপ নিয়ে মত্ত হয়ে আছে নিশ্চয়ই।

ইরানি প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে এল লেবুবাগানের কাছে। ভেতরে ঢুকতে যাবার আগেই এককড়ি বলে উঠল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, ওই তিনটে গাছ বাদ দিয়ে, ওদের ছুঁয়ো না !"

ইরানি থমকে দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল এককড়ির দিকে। এই লোকটা কী যে আবোল-তাবোল বকে, তার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।

"কেন, এই তিনটে গাছ ছোঁয়া যাবে না কেন ?"

এককড়ি একদিকে আঙুল তুলে বলল, "ওই যে ওইটা, ওইটা আর ওইটা। ও-তিনটে বড্ড পাজি। ওদের বিশ্বাস নেই।"

ইরানির রাগ হয়ে গেল। তাকে কি ওরা ছেলেমানুষ ভেবেছে ? যা-তা

বলে ভয় দেখাবে ?

এককড়ি যে গাছগুলোর দিকে আঙুল তুলেছে, ইরানি এগিয়ে গিয়ে সেই একটা গাছের গায়ে হাত রাখল। কিছুই হল না। পর পর তিনটে গাছকেই ছুঁয়ে দিল সে।

মুখ ফিরিয়ে রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই তো ছুঁলাম ! কী, হল কী ?"

এককড়ি বলল, "এখন তোমাকে দেখে গো-বেচারা সেজেছে। আসলে ওরা পাজি। তোমার ভাইকে তো ঐ একটা গাছই মেরেছিল।"

ইরানি কেষ্টর দিকে তাকাল। তার মুখ দেখে মনে হয় যেন সেও এইসব কথা একটু-একটু বিশ্বাস করে।

ইরানি এককড়িকে ধমক দিয়ে বলল, "এসব বাজে কথা আর আমি শুনতে চাই না।"

তারপর সে ঢুকে পড়ল লেবুবাগানের মধ্যে।

কাল রাত্তিরে খুব বৃষ্টি পড়েছে। মাটি ভিজে-ভিজে। কেউ এখানে ঢুকলে তার পায়ের দাগ বোঝা যাবে। কিন্তু ইরানি কোনো পায়ের ছাপ দেখতে পেল না।

পুরো লেবুবাগানটা ঘুরে দেখে এল, কোথাও দিপুর কোনো চিহ্ন নেই।

জ্যাঠামশাইয়ের মতন দিপুও হারিয়ে যাবে, এটা ইরানি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। দিপু কি ইচ্ছে করে তাকে কষ্ট দিতে পারে ?

পেয়ারাবাগানটা অনেক ফাঁকা-ফাঁকা। বাজ পড়ে অনেকগুলো গাছ ঝলসে গেছে। সেই বাগানের ভেতরে ঢোকার দরকার হয় না, বাইরে থেকেই বোঝা যায় যে, ভেতরে কেউ নেই।

ইরানি চলে এল পুকুরধারে।

পুকুরঘাটে লুঙ্গিপরা, খালি গায়ে একজন লোক বসে আছে। লোকটি মুখ ফেরাতেই ইরানি চিনতে পারল, আগের দিনের সেই পাগল মুরশেদ।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করল, "ও মুরশেদভাই, আমাদের খোকাবাবুটিকে সকালে কোথাও দেখেছ নাকি ?"

কেষ্টর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুরশেদ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল

ইরানির দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "**আর-একজন** মিসিং ? বড়বাবুর পর ছোটবাবু ? ওরা আমাকে কেন নেয় না বলো তো !"

এককড়ি বলল, "তোমাকে আর নিতে বাকি আছে কী ? তুমি কি আর নিজের মধ্যে আছ ? ওসব কথা ছাড়ো। ছেলেটিকে দেখেছ কোথাও ?"

ইরানির হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। এখানে কি সবাই পাগল ? কারুর কাছ থেকে একটা সহজ উত্তর পাওয়া যাবে না ? দিপুকে সে এখন কোথায় খুঁজবে ?

ইরানি অতিকষ্টে নিজেকে সামলাল। এদের সামনে সে কিছুতেই দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।

কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, "আমি থানায যাব !"

॥ ১৪ ॥

মুরশেদ বলল, "থানায় গিয়ে কী লবডঙ্কা হবে ? এ কি সিঁদকাটা কিংবা গোরুচুরির ব্যাপার ? মাঝরাত্তিরে এই পুকুরঘাটে এসে দাঁড়িও, তার যদি দেখা পাও !"

এককড়ি বলল, "তুমি কি কাল মাঝরাত্তিরে এসেছিলে ?"

মুরশেদ দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না গো, না ! আমি চাইলেও আসতে পারি না। পেছন থেকে চুল টেনে ধরে।"

ইরানি এবার মধুকে ডেকে বলল, "আমি থানায় যাব।"

মধু বলল, "হ্যাঁ, তা তো থানায় যেতেই হবে। আর উপায় কী ? এককড়ি, তুমি দিদিমণিকে থানায় নিয়ে যাও !"

এককড়ি চমকে উঠে বলল, "আমি ? ওরে বাপ রে, আমি থানা-টানায় যাই না !"

কেষ্ট বলল, "তোমায় তো এমনিই যেতে হবে। কাল দারোগাবাবু হুকুম দিয়ে গেছেন না ? না গেলে তোমায় হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে বলেছে !"

ইরানি মধুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যাবেন না ?"

মধু বলল, "আমি বরং এখানটায় থাকি। যদি খোকাবাবু এসে পড়ে···আমার তো মনে হয় এদিক-সেদিক গেছে, গাঁয়ের দিকেও যেতে

পারে।"

মুরশেদ বলল, "সে-গুড়ে বালি ! থানাতেও পাবে না, গাঁয়েতেও পাবে না।"

ইরানি এককড়িকে বলল, "চলুন !"

এককড়ি বলল, "আসছি, একটুখানি দাঁড়াও !"

এক দৌড়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটু বাদেই ফিরে এল। কাঁধে একটা গেরুয়া চাদর, হাতে একটা পুঁটুলি।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করল, "ও সব কী নিয়ে যাচ্ছ ?"

এককড়ি মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল, "তোমাদের কোনো সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছি না ! আমায় কি চোর ঠাউরেছ ? আমি কালী-সাধক ! থানায় গেলেই তো আমায় গারদে ভরে দেবে। সেখানে আমার পান-সুপুরি নিয়ে যেতে হবে না ? চলো তো দিদিমণি !"

লম্বা তালগাছ দুটোর মাঝখান দিয়ে ওরা এসে পড়ল গ্রামের রাস্তায়।

ইরানির বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল করছে। সত্যিই দিপু নেই ? সে বারবার ফিরে তাকাতে লাগল পেছন দিকে। যেন দিপু ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে, এক্ষুনি বেরিয়ে এসে হাসবে।

খানিকটা যাওয়ার পর ইরানি জিজ্ঞেস করল, "থানা কত দূরে ?"

এককড়ি বলল, "তা একটু দূর আছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলে সংক্ষেপ হয়। তুমি কি মাঠ দিয়ে হাঁটতে পারবে ?"

"হ্যাঁ, পারব।"

"ডান দিকে নেমে পড়ো তা হলে। আলের ওপর দিয়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে দেখেশুনে হাঁটো, সাপখোপ থাকতে পারে।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? সত্যি উত্তর দেবেন ?"

"বলো, দিদিমণি। সত্যি কথা বলব না কেন ?"

"আপনি কি সত্যি পাগল, না ইচ্ছে করে পাগল সাজার ভান করেন ?"

"এই দ্যাখো ! আমি সত্যিকারের পাগলও নই, সেজেও থাকি না। আমি এই রকমই।"

"তবে তখন বললেন কেন, তিনটে গাছ পাজি ? গাছেদের মধ্যে তিনটে পাজি তিনটে ভাল, এরকম আবার হয় নাকি ?"

"ও তুমি বুঝবে না দিদিমণি। তোমার ভাই খানিকটা বুঝেছিল। ও-সব বোঝবার জন্য আলাদা চোখ চাই। একটা তক্ষক ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ?"

"তক্ষক কী?"

"তাও জানো না। গিরগিটি দেখেছ তো? বড় গিরগিটির মতন এক ধরনের সাপ। ভয়ের কিছু নেই। অনেক দূরে আছে। ওই যে সামনে অশথগাছটা দেখছ, ওর কোটরে বসে ডাকছে। ঐ তক্ষকটা আসলে এই মাত্র আমায় একটা কথা বলল। আমায় সাবধান করে দিল। এখন এটা তুমি বিশ্বাস করতেও পারো, নাও পারো।"

"আপনি কি আমাকে রূপকথা শোনাচ্ছেন? রূপকথায় জন্তু-জানোয়ারেরা কথা বলে।"

"হে, হে, হে, হে! ভাল বলেছ! বুঝলে দিদিমণি, আমাদের মতন মানুষের কাছে এই জীবনটাই রূপকথা!"

"তক্ষক কী বলল আপনাকে?"

"বলল, ওহে এককড়ি, আজ একাদশী, আজ থানায় যেও না। গেলে তোমার বিপদ হবে!"

এত দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যেও ইরানি হেসে ফেলল।

এককড়ি কিন্তু ঘোরালো মুখ করে বলল, "হাসলে তো? বিশ্বাস হল না? তোমরা শহরের লোক, অনেক কিছু মানো না!"

"থানায় গেলে আপনার বিপদ হবে, তা এতদূরে বসে ঐ তক্ষক জানল কী করে?"

"ভূমিকম্প হবার অনেক আগে পিঁপড়েরা তা টের পেয়ে যায়। মানুষ যা জানতে পারে না, তা পিঁপড়ের মতন ঐটুকু প্রাণী জানতে পারে কী করে?"

"আপনি পশুপাখিদের ভাষা বোঝেন?"

"এক-এক সময় বুঝি। এক-এক সময় বুঝি না।"

"কার কাছে শিখেছেন?"

"ও শিখতে হয় না। মনটা যখন চাঙ্গা থাকে, তখন আপনা-আপনি সব টের পাওয়া যায়।"

"আমি এরকম কথা আগে কক্ষনো শুনিনি। তবে একটা কথা হঠাৎ

মনে পড়ল। রামায়ণে পড়েছি, রামচন্দ্র বনের পশুপাখি, গাছপালাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সীতা কোথায় ! আপনি যখন ওদের ভাষা বোঝেন, তা হলে ওই তক্ষকটাকে জিজ্ঞেস করুন না, দিপু কোথায় গেছে ?"

"সে কোথায় গেছে, তা তো আমি বুঝেই গেছি। কিন্তু বলবার উপায় নেই যে !"

"তার মানে ? দিপু কোথায় আছে তা জেনেও আপনি বলবেন না ? শুধু শুধু আমায় থানায় নিয়ে যাচ্ছেন !"

"থানায় তো তুমিই ইচ্ছে করে যেতে চাইলে। আমি তো যাবার কথা বলিনি।"

"দিপু কোথায় ?"

"সে-কথা বলার উপায় থাকলে তো বলতুমই। বলতে গেলেই ওনারা আমার গলা চেপে ধরবে।"

"ওনারা ? কারা ?"

"সেকথাও বলা যাবে না। সব কথা কি আর সব সময় বলা যায় ?"

"আপনি আমাকে ভূতের ভয় দেখাচ্ছেন ?"

"ভূত মোটেও নয়। এখেনে একটু দাঁড়াও। তুমি যখন বললে, তখন একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।"

মাঠের মধ্যে একলা একটা অশথ গাছ দাঁড়িয়ে। ওরা তার কাছে এসে পৌঁছেছে।

এককড়ি তার মুখের দু'পাশে দু'হাত দিয়ে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ করল, "তক্কো ! তক্কো !"

সঙ্গে-সঙ্গে গাছের কোনো এক জায়গা থেকে ঠিক সেইরকম আওয়াজ এল : তক্কো, তক্কো, তক্কো !

ইরানির সারা গা শিউরে উঠল একবার।

এককড়ির মুখে একগাল হাসি। ইরানির হাত ধরে বলল, "কী উত্তর দিয়েছে জানো ! বলল, তোমার ভাই ভাল আছে, চিন্তা কোরো না। আমিও তাই জানতুম। ওরা ছোট ছেলেদের কোনো ক্ষতি করে না।"

ইরানি আর চোখের জল আটকাতে পারল না। হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে এবার সে বলল, "আপনি...আপনি সত্যি একটা খারাপ

লোক···অকৃতজ্ঞ···আমার জ্যাঠামশাই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনি তার প্রতিদান দিচ্ছেন এইভাবে ? দিপু কোথায় আছে তা জেনেও আপনি আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন না ?"

এককড়ি তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "ও কী দিদিমণি, তুমি কাঁদছ কেন ? আমি কি ইচ্ছে করে তোমায় কষ্ট দিতে চাই ? আমার উপায় নেই যে। ওই সব কথা বলতে গেলেই আমার জিভ আটকে যায়। বিশ্বাস করো ! আমি যদি জোর করে বলার চেষ্টা করি, তা হলে আমার কী হবে জানো ? একেবারে বাক্‌রোধ হয়ে যাবে ! এসব হল তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার, এসব নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। মুরশেদমাস্টার তো ঐ করতে গিয়েই পাগল হয়ে গেছে !"

"দিপুকে নিয়ে আজ সকালেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব ভেবেছিলুম !"

"আজ না হয় কাল যাবে !"

"দিপু কোথায় ? আপনাকে বলতেই হবে !"

আচমকা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল এককড়ি। সেই অবস্থাতেই হাতজোড় করে বলতে লাগল, "আমায় ক্ষমা করো, দিদিমণি। ক্ষমা করো ! এইটুকুনি শুধু বলি, আমার কোনো দোষ নেই। আমি চলে যাচ্ছি, আর আমার মুখ দেখতে হবে না তোমাকে !"

"আপনি চলে যাবেন মানে ? আমি থানায় পৌঁছব কী করে ?"

"ওই যে পুকুরধারে বাড়িটা দেখছ, ওইটাই থানা। তুমি সিধে চলে যাও। আমি গেলেই আমাকে ধরে রাখবে। আমি এইখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। বড়বাবু আমায় ডেকে এনে অন্ন দিয়েছিলেন, তাঁর ঋণ জন্মে শোধ হবে না। চলি, দিদিমণি !"

এককড়ি পিছন ফিরে এক দৌড় লাগাল।

ইরানি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারল, এককড়িকে আর ডাকলেও ফেরানো যাবে না।

তারপর সে নিজেই পুকুরের ধার দিয়ে এসে থানার মধ্যে ঢুকল।

ভেতরে দারোগাবাবু বসে আছেন চেয়ারে। টেবিলের উলটো দিকে বসে আর একটি লোক ঝুঁকে পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি

একবার মুখ ফেরাতেই ইরানি তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠল।
এ সেই ট্রেনের অদ্ভুত লোকটি। যে ডাকাতদের জব্দ করে তাদের রিভলভারটা নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিল।

॥ ১৫ ॥

অমিত পরীক্ষা দিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই জিজ্ঞেস করল, "ছোটমা, দিপুরা ফেরেনি ?"

মা দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া। অমিতকে দেখে সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করে বললেন, "না রে, এখনো তো এল না ! বর্ধমানের ট্রেন ক'টায় আসে ?"

অমিত জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "সারাদিন অনেক ট্রেন আসে। ওদের তো দুপুরের 'মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল !

মা চুপ করে রইলেন।

অমিত আবার জিজ্ঞেস করল, "কাকামণি কেমন আছেন ?"

"আজ অনেকটা ভাল। দুপুরে নিজেই হেঁটে হেঁটে বাথরুমে গেলেন। হ্যাঁ রে অমিত, আজ ট্রেনের কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো ? প্রায়ই তো কী সব গোলমালে ট্রেন আটকে যায় !"

"সে রকম কিছু শুনিনি তো কাকিমা ! আমাদের কলেজের অনেক ছেলেই তো ট্রেনে আসে। সবাই আজ এসেছে। দীপ্তেন্দু আসে শক্তিগড় থেকে, তার সঙ্গেও দেখা হল। ট্রেনের কিছু গোলমাল হলে নিশ্চয়ই সে বলত !"

"তোর কাকা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ! জানিসই তো, দিপুটা একটু পাগলাটে স্বভাবের। কোথায় না কোথায় চলে যায় !"

"ইরানি তো সঙ্গে আছে। ও ঠিক বকে বকে দিপুকে সামলে রাখতে পারবে। রঘু কী বলেছে, ওরা আজ সকালেই ফিরবে বলেছিল তো ?"

"তাই তো বলেছিল !"

"রঘু, রঘু ! শোন্ তো এদিকে।"

অমিতের ডাক শুনে রঘু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদের কথাবার্তা সে শুনেছিল। অমিত কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, "আমি তো আসতে চাইনি ! দিদিমণি আমাকে ধমকে পাঠিয়ে দিলেন ! আমি থাকলে বড়বাবুকে ঠিক খুঁজে বার করতুম।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই যখন চলে এলি, তখন তোকে ওরা কী বলে দিয়েছিল ? আজ ফেরার কথা বলেনি ?"

"ইরানি দিদিমণি বলেছিল, কিন্তু দিপুদা কিছু বলেনি !"

"ইরানি তো বলেছিল ঠিক আজ ফিরবে, তা হলে এল না কেন ?"

"রাত্তিরে কী হয়েছে কে জানে ! ও জায়গাটায় ভূত আছে !"

অমিত বলল, "চাপ্, বাজে কথা বলিস না !"

রঘু চোখ কুঁচকে, মাথা নেড়ে বলল, "আমায় বকো আর যাই করো, আমি তবু বলব, ও জায়গাটায় ভূত আছে !"

মা বললেন, "তুই দিনের বেলায় গেলি, দিনের বেলাতেই ফিরে এলি, তার মধ্যে কি তুই ওখানে ভূত দেখে ফেললি ?"

রঘু বলল, "দেখতে হবে কেন ! জায়গাটাতেই ভূত-ভূত গন্ধ ! বাজ পড়ে পুকুরের জল শুকিয়ে যায়, যখন-তখন বৃষ্টি নামে, এই যে মাত্তর এইটুকুনি জায়গা জুড়ে। এককড়ি বলে একটা লোক আছে, তাকে দেখলেই মনে হয় ভূতের মন্তর জানে !"

অমিত বলল, "এককড়ি তোকে দেখে আবার কিছু মন্তর-টন্তর পড়েনি তো ?"

রঘু বলল, "আমায় কেউ কিছু করতে পারবে না। এই দেখছ না, আমার গলায় এই মাদুলি রয়েছে ! আমাদের গেরামের মা-কালীর মন্দিরের মাদুলি। আমাদের মা-কালী খুব জাগগ্রোত্ !"

অমিত বলল, "আমি তো তোর গা থেকেই ভূতের গন্ধ পাচ্ছি। ক'দিন চান করিসনি ?"

মা বললেন, "হ্যাঁ রে রঘু, ওরা এল না কেন ? সকালবেলায় বেরুলে তো এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা।"

রঘু বলল, "একটা কথা বলেন তো মা, দিদিমণিদের ঐ ভূতুড়ে জায়গায় রাত্তিরবেলা থেকে যাবার দরকারটাই বা কী ছিল ? রাত্তিরে কি

ওনারা বনে-জঙ্গলে জ্যাঠাবাবুকে ঢুঁড়তে যাবেন ? ঐ এককড়ি যা একখানা কথা বলেছিল না, তা তো আপনাদের বলিইনি !"

"কী বলিসনি ? কী বলেছিল এককড়ি ?"

"সে শুনলে আপনারা আরও ভয় পেয়ে যাবেন !"

"আচ্ছা পাজি ছেলে তো ! কী বলেছিল বল্ ?"

"ঐ এককড়ি বলেছিল, ওখানকার গাছগুলো নাকি কথা বলে !"

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না ! মিথ্যে কথার ডিপো একটা !"

রঘু বলল, "আমি মিথ্যে কথা বলি ? মোটেই না ! মা-কালীর দিব্যি বলছি !"

মা ধমক দিয়ে বললেন, "অ্যাই, তোকে বলেছি না যখন-তখন ঠাকুর-দেবতার নামে দিব্যি কাটবি না !"

অমিত বলল, "আমি ওখানে কতদিন থেকেছি, চমৎকার জায়গা !"

রঘু তবু বলল, "ওখানকার নেবুবাগানটার মধ্যে একটা পাগলকে দেখেছিলুম । সে তো গাছপালার কথা শুনে-শুনেই পাগল হয়ে গেছে !"

অমিত বলল, "মুরশেদ মাস্টার ! তবে তাকে আমি চিনি । সে ওইরকমই !"

দোতলার ঘর থেকে বাবা রঘুর নাম ধরে ডাকলেন । তারপর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রঘু, কার সঙ্গে কথা বলছিস ? অমিত ফিরেছে ?"

মা বললেন, "রঘু, তুই যা । বাবুকে গিয়ে বল অমিত যাচ্ছে একটু পরে !"

রঘু চলে যেতেই মা বললেন, "কী হবে এখন অমিত ? তোর কাকা যে বড্ড উতলা হয়ে পড়েছেন ?"

অমিত ভুরু দুটো কুঁচকে বলল, "এমন বিচ্ছিরি সময়ে আমার পরীক্ষাটা পড়ল ! বাবার কোনো খবর নেই । ইরানি আর দিপু গিয়েও ফিরল না ! কাকিমা, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে !"

মা বললেন, "দিপুটা পাগলাটে হলেও ইরানির তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে । ওর তো ফিরে আসা উচিত ছিল । ওদের আবার কোনো বিপদ হয়নি তো !"

অমিত বলল, "ওখানে মধুদা আছে, কেষ্ট আছে। তারা খুব বিশ্বাসী। তারা থাকতে ওদের কোনো বিপদ হতে পারে না। কাকিমা, আমি আজই সাড়ে-সাতটার ট্রেনে চলে যাব?"

"পরীক্ষাটা নষ্ট করবি? চল, তোর কাকাকে বলি, যদি আর কারুকে পাঠানো যায়!"

অমিতের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাবা খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত হেঁটে চলে এসেছেন। মা এসে বললেন, "তুমি এর মধ্যেই এত হাঁটাহাঁটি শুরু করলে কেন? প্রিয়তোষবাবু তোমায় বিশ্রাম নিতে বলেছেন!"

বাবা বললেন, "তোমাদের কথা শুনেই তো আজ দিপু আর ইরানিকে পাঠাতে রাজি হলুম। আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। রঘুর মুখে তো শুনলে যে ওরা ওখানে গিয়ে দাদার কোনো খোঁজ পায়নি। নিজেরা সর্দারি করে থেকে গেছে। এখন কিসের থেকে কী যে হয়!"

অমিত বলল, "কাকামণি, আমিই বরং চলে যাই আজ। একটা পরীক্ষা নষ্ট হলে কী আব হবে!"

বাবা বললেন, "তুই গিয়েই বা কী করতে পারবি? আমি না গেলে কোনো কাজ হবে না। এক কাজ কর, একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারবি? মেমারি আর কতটাই বা দূর! গাড়িতে করে যাব, সব খোঁজখবর নিয়ে কাল সকালের মধ্যে ফিরে আসব!"

মা বললেন, "তুমি যাবে এই শরীরে! তারপর তুমি নিজেই একটা কিছু বিপদ ঘটাবে। আমার দাদার বাড়িতে খবর পাঠাচ্ছি। ওখানে কারুকে না কারুকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়!"

এমন সময় জুতো মশমশিয়ে ওপরে উঠে এলেন পরিতোষ ডাক্তার। তাঁকে দেখে সবাই একসঙ্গে চুপ করে গেল!

পরিতোষ ডাক্তার হাল্‌কা সুরে বললেন, "কী ব্যাপার? কী গোপন কথা হচ্ছিল, আমায় দেখে থেমে গেলে?"

মা বললেন, "দিপু আর ইরানি আজও ফেরেনি!"

পরিতোষ ডাক্তার তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন। এ-বাড়ির সবাই তাঁর আত্মীয়ের মতন। তিনি বুঝতে পারলেন ঘটনার গুরুত্ব। দিপু আর

ইরানি দু'জনেই এখনও ছেলেমানুষ, তারা বর্ধমানের গ্রামে আগের দিন গিয়েও ফিরে আসেনি। বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল একদিনের মধ্যে ফিরে আসতে। ওরা তো জানে যে ঠিক সময়ে না ফিরলে বাড়ির সবাই কত চিন্তা করবে। তবু যখন ফেরেনি, তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণে আটকে গেছে!

বাবা বললেন, "শোনো, পরিতোষ। এভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুশ্চিন্তা করলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আজ তো অনেকটা ভাল আছি, হাঁটতেও পারছি। সেই জন্য আমি অমিতকে বলেছি একটা গাড়ি ভাড়া করতে। সেই গাড়ি নিয়ে আমি নিজেই যাব বর্ধমান।"

পরিতোষ ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললেন, "গাড়ি ভাড়া করতে হবে কেন? আমার গাড়িই তো আছে। অরুণ, তুমি একাই বা যাবে কেন, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না?"

বাবা বললেন, "তুমি যাবে? তোমার রুগি-টুগি দেখা আছে। তুমি ব্যস্ত মানুষ।"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "মনে করো, আমার নিজের দাদা দূরে কোথাও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমার ভাইপো-ভাইঝিরা তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে ফিরছে না। তা হলেও কি আমি নিজের কাজের ব্যস্ততার কথা ভেবে সেখানে যেতুম না?"

বাবা বললেন, "তা হলে চলো!"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "যাব, দরকার হলে নিশ্চয়ই যাব। তার আগে আর একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সেটা এইমাত্র আমার মনে পড়ল। পুলিশের একজন বড়কর্তার সঙ্গে আমার চেনা আছে। আমাকে খুব খাতির করেন। তাঁকে একবার বলে দেখি, পুলিশ-সূত্রে ওখানকার স্থানীয় থানা থেকে কোনো খবর আনানো যায় কি না!"

অমিত বলল, "তাতে তো অনেক সময় লেগে যাবে!"

ডাক্তার বললেন, "কেন সময় লাগবে? ওখানকার লোক্যাল থানায় ফোন করলেই জানা যাবে!"

অমিত বলল, "আমাদের ওদিককার থানায় টেলিফোন নেই। ছোট থানা, জিপগাড়িও নেই!"

ডাক্তার বললেন, "এমনি সাধারণ টেলিফোন না থাকলেও রেডিও-টেলিফোন থাকবেই। তা দিয়ে কাছাকাছি বড় থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আগে একবার আমি বাঁকুড়ার এক গ্রামে একটা জরুরি খবর পাঠাবার জন্য পুলিশের কাছ থেকে এই সাহায্য পেয়েছিলুম। এক ঘণ্টার মধ্যে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। অমিত, তুমি ওখানকার থানার নামটা লিখে দাও তো আমাকে। তোমার বাবার নাম, গ্রামের নাম সব লিখে দাও।"

অমিত একটা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, "শোনো অরুণ, আমি চেম্বারে গিয়ে এক্ষুনি ফোন করছি। এর মধ্যে আমার আজকের কাজ যা আছে তাও সেরে নিচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনো খবর না আসে তা হলে আমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, তুমি মোটামুটি তৈরি হয়ে থেকো।"

পরিতোষ ডাক্তার ব্যস্তভাবে চলে যেতে যেতেও সিঁড়ির কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে মাকে বললেন, "শোনো বৌদি, তুমিও মোটামুটি তৈরি হয়ে নাও! আমি আর অরুণ যদি তোমাকে এখানে রেখে চলে যাই, তা হলে তুমি যে সারারাত ঘুমোতে পারবে না তা জানি। সুতরাং তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। অমিতের পরীক্ষা, তাকে তো থাকতেই হবে!"

॥ ১৬ ॥

পরিতোষ ডাক্তারের এক ঘণ্টার মধ্যে খবর দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা কেটে গেল, তবু তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এল না। বাবা উতলা হয়ে রঘুকে পাঠালেন ওঁর চেম্বারে। রঘু ফিরে এসে খবর দিল, ডাক্তারখানা বন্ধ। ডাক্তারবাবুর গাড়িও সেখানে নেই।

বাবা রীতিমতন অবাক হয়ে গেলেন। কোনো জরুরি কল্ পেয়ে চলে যেতে হল পরিতোষ ডাক্তারকে? কিন্তু চেম্বার তো কাছেই, যাবার আগে সে-কথা জানিয়ে যেতে পারতেন নিশ্চয়ই। পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওয়্যারলেসে খবর আনাবার কথা ছিল, তারও যে কী হল তা বোঝা গেল না। বাবা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন আর রাস্তার ধারের জানালায় গিয়ে

দাঁড়াচ্ছেন।

মায়ের মুখখানা আরও ঘুঁচিমুচি হয়ে গেছে। মায়েরা সব সময় বেশি বিপদের কথা চিন্তা করেন তো!

মা ঘরে ঢুকে বললেন, "তা হলে পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু খারাপ খবর এসেছে! না হলে উনি এলেন না কেন?"

বাবা বললেন, "তুমি বেশি ব্যস্ত হয়ো না। পরিতোষ ঠিকই আসবে!"

বলতে-বলতেই বাবা ছুটে গেলেন বারান্দায়, রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। কিন্তু সেটা ট্যাক্সি, পাশের বাড়িতে কেউ এসেছে।

এরও আধঘণ্টা বাদে এল একটা পুলিশের গাড়ি। সেই গাড়ি থেকে নামলেন পরিতোষ ডাক্তার আর একজন অচেনা ভদ্রলোক। তিনি পরে আছেন সাধারণ প্যান্ট-শার্ট, দেখলে পুলিশ বলে মনেই হয় না।

ওপরে এসে পরিতোষ ডাক্তার আলাপ করিয়ে দিলেন, "ইনি হচ্ছেন রমেন সরকার, ডি· আই· জি·, ক্রাইম। আমার দেরির জন্য চিন্তা করছিলে তো? জানোই তো টেলিফোনের কী অবস্থা, কিছুতেই লালবাজারের কানেকশান পাচ্ছিলুম না, তাই নিজেই চলে গেলুম লালবাজারে। সেখান থেকে অনেক চেষ্টা করা হল মেমারি থানাকে ধরার···"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খবর পাওয়া গেল?"

রমেন সরকার বললেন, "মেমারি থানাকে পেয়েছি। কিন্তু ওখান থেকে আপনার গ্রাম, ঐ যে কী নাম যেন, ঘোড়াডাঙা, সেখানকার থানাটা আর কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওদের যন্ত্রটা খারাপ। মেমারি থানা থেকে ওদিককার খবর বিশেষ কিছু বলতে পারল না, তবে ঘোড়াডাঙার দিকে নাকি আজ দুপুরের দিকে খুব ঝড় হয়েছে, অনেকগুলো বাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে।"

বাবা বললেন, "নভেম্বর মাসে ঝড়?"

রমেন সরকার বললেন, "তাই তো শুনলাম!"

বাবা বললেন, "ওদের যখন খবর পাওয়া গেল না, তা হলে তো যেতেই হয়! আর দেরি করার কোনো মানে হয় না! পরিতোষ, তুমি তা হলে কী ঠিক করলে?"

ডাক্তার বললেন, "শোনো অরুণ, সব ঘটনাটা আমি রমেনবাবুকে

বলেছি। ইনি কী পরামর্শ দিচ্ছেন শোনো !"

রমেন সরকার বললেন, "ঘটনাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একজন বয়স্ক লোক নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন কেন ? তারপর আপনার ছেলেমেয়েদের পাঠালেন, ওদের পাঠাবার আগে একবার আমাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল। জানেন তো, আজকাল প্রায়ই ট্রেনে ডাকাতি হয় ? আপনার ছেলেমেয়েরা যে-সময়ে গেছে, প্রায় সেই সময়েই সেদিন বর্ধমান লাইনে একটা ট্রেন ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল !"

বাবা বললেন, "অ্যাঁ ? ট্রেন ডাকাতি ? ওরা নির্ঘাত ডাকাতের পাল্লায় পড়েছে, শেষ পর্যন্ত ঘোড়াডাঙায় পৌঁছতেই পারেনি !"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা সব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি সব ভুলে গেলে নাকি ? রঘু ওদের সঙ্গে গিয়েছিল না ? রঘু তো গ্রাম পর্যন্তই ওদের সঙ্গে গিয়েছিল !"

বাবা বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো ! রঘু কি ট্রেন-ডাকাতির কথা বলেছিল ?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, বিশ্বাস করিনি। ও যা বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে !"

রমেন সরকার বললেন, "আপনারা আজ রাত্তিরেই যাওয়ার কথা ভাবছিলেন তো ? আমার মতে, আপনাদের সবার যাবার দরকার নেই। তা ছাড়া, আপনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। আমাকে বিশেষ কাজে বর্ধমানে যেতে হবে আজ রাত্তিরেই। সাড়ে দশটার সময় রওনা দেব। আমার জিপেই আপনারা একজন কেউ যেতে পারেন, কেউ না গেলেও অবশ্য চলে। আমি নিজে গিয়ে আপনাদের ছেলে-মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসব !"

ডাক্তার বললেন, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না। রমেনবাবু নিজেই যখন যাবেন বলছেন !"

বাবা বললেন, "তাহলে আমিই যাচ্ছি। আমি তৈরিই আছি, এক্ষুনি বেরুতে পারি।"

রমেন সরকার বললেন, "আপনিই যাবেন ?"

ডাক্তার বললেন, "অরুণ, তোমার তো আর এক্ষুনি যাবার দরকার

নেই। রমেনবাবু নিজেই যাচ্ছেন যখন। তোমার শরীর এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি।"

বাবা বললেন, "আমি যাব একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। রমেনবাবু যদি সঙ্গে নিতে না চান, তা হলেও আমাকে যেতে হবে।"

এক মিনিট ঘরের সবাই চুপ করে গেল।

তারপর ডাক্তার বললেন, "ঠিক আছে, চলো, তোমার সঙ্গে আমিও যাব। রমেনবাবু, আপনার গাড়িতে দু'জনের জায়গা হবে নিশ্চয়ই ?"

রমেনবাবু মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার দিপুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৌদি, তোমার আর যাওয়া হল না। তুমি আজ রাত্তিরটা না-ঘুমিয়েই কাটিয়ে দাও। কাল দুপুরের মধ্যেই ভাল খবর পেয়ে যাবে।"

তৈরি-টৈরি হয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগল। জিপটা স্টার্ট করল রাত পৌনে এগারোটায়।

এই সময় রাস্তা ফাঁকা। জিপে রমেনবাবুর একজন দেহরক্ষীও রয়েছে। গাড়িটা ছুটছে খুব জোরে আর হুহু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা।

বাবা বললেন, "এখানে এ-রকম আকাশ, আর বর্ধমানে ঝড়বৃষ্টি হয় কী করে ?"

ডাক্তার বললেন, "আজকাল আবহাওয়ার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। গরমকালে বৃষ্টি হয় না, শীতকালে বৃষ্টি।"

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অরুণবাবু, আপনার দাদা, যিনি বর্ধমানের ঐ গ্রামে গিয়ে চাষবাস করছিলেন, তিনি লাস্ট কবে কলকাতায় এসেছিলেন ?"

বাবা একটু ভেবে বললেন, "তা প্রায় বছরখানেক হবে। আসল কথা কী জানেন, আমার দাদা কলকাতায় আসতেই চাইতেন না। গ্রামটা এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে; তিনি ওখানেই শান্তিতে থাকতেন। দাদা বলতেন, কলকাতার রাস্তায় এত গর্ত, বাতাসে এত ধোঁয়া, এর মধ্যে তোরা থাকিস কী করে ?"

ডাক্তার বললেন, "আমি আবার গ্রাম-ট্রামে গিয়ে দু'তিন দিনের বেশি

টিকতে পারি না। যতই টাটকা হাওয়া থাক আর পাখি-টাখি ডাকুক, সন্ধের পর আর কিছুই করার থাকে না।"

রমেনবাবু বললেন, "আপনার দাদা এই যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, এটা শুনে আমার অন্য একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেটাও এই বর্ধমানের দিকেরই ঘটনা।"

ডাক্তার বললেন, "কী শুনি ঘটনাটা?"

রমেনবাবু বললেন, "গ্রামের নামটা আমি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। সেই গ্রামে একটা বেশ বড় স্কুল আছে। পুরনো স্কুল, এক সময় খুব নামডাক ছিল, তারপর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। স্কুলটা উঠে যাবারই প্রায় উপক্রম হয়েছিল, এই সময় সেখানে একজন নতুন হেডমাস্টার এলেন। ভদ্রলোকের বয়েস খুব বেশি নয়, বছর-চল্লিশেক হবে, স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছেলেদের সঙ্গে তিনি ফুটবলও খেলতেন। এই হেডমাস্টার ভদ্দরলোক দারুণ পরিশ্রম করে স্কুলটাকে আবার দাঁড় করালেন। লোকের কাছ থেকে 'চেয়ে-চিন্তে টাকা আদায় করে স্কুল-বিল্ডিংটা সারালেন, ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সারা বর্ধমানে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।"

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ ভদ্রলোক উধাও হয়ে গেলেন?"

রমেনবাবু বললেন, "শুনুন না ব্যাপারটা। দিল্লি থেকে প্রতি বছর সারা দেশের ভাল-ভাল শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় জানেন তো? বছর পাঁচেক আগের কথা বলছি, তখন আমি বর্ধমানের এস· পি· ছিলাম, সেই বছর ঐ ভদ্রলোক জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন। কিন্তু সেই চিঠি পাঠাতে গিয়ে দেখা গেল, ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার যেন মনে পড়ছে কাগজে এ-রকম একটা খবর দেখেছিলাম সেই সময়ে। হেডমাস্টারমশাইয়ের নাম নারায়ণ মণ্ডল না? তাঁকে আর তো খুঁজেই পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত!"

রমেনবাবু বললেন, "আমি নিজে গিয়েছিলুম তদন্ত করতে। আশ্চর্য ব্যাপার মশাই! ভদ্রলোক এত সাকসেসফুল। কাছাকাছি দশ-বিশখানা গ্রামের সব মানুষ তাঁকে ভালবাসে। তিনি এমন কিছু ধনী লোক নন যে,

চোর-ডাকাতরা তাঁর ওপর নজর দেবে। তাঁর বাড়িতে সব জিনিস যেমনটি তেমনি পড়ে আছে। দেখলেই মনে হয় যেন ভদ্রলোক উঠে বাথরুমে গেছেন, এক্ষুনি ফিরে আসবেন! ওঁর বাড়িতে রান্না করার যে লোকটি ছিল, সে বলেছিল যে, হেডমাস্টারমশাই সন্ধের পর পাশের বাগানটায় একটু বেড়াতে গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে আর ফেরেননি। একেবারে অদৃশ্য!"

বাবা অস্ফুট স্বরে বললেন, "বাগান? কিসের বাগান?"

রমেনবাবু বললেন, "এমনি গ্রামের বাগান যে-রকম হয়। কোনোরকম ট্রেসই আর পাওয়া গেল না। গ্রামের কোনো লোক তাঁকে রেল-স্টেশনের দিকে যেতে দেখেনি।"

ডাক্তার বললেন, "আশ্চর্য!"

রমেনবাবু বললেন, "সত্যি আশ্চর্য। তবে এখনও একটু বাকি আছে। সেই হেডমাস্টারের শেষ পর্যন্ত সন্ধান একটা পাওয়া গিয়েছিল, প্রায় তিন বছর বাদে।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?"

রমেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ। হরিদ্বারে। তিনি তখন সাধু। মুখভর্তি দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল। ওঁর একজন ছাত্র চিনতে পেরেছিল। ছাত্রটি 'স্যার স্যার' বলে পা জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু সেই সাধু তখন মৌনীবাবা। হরিদ্বারের কোনো লোক তাঁকে একটাও কথা বলতে শোনেনি। সেই ছাত্রটি তাঁর পা ধরে অনেক কান্নাকাটি করার পর তিনি এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, 'আমি এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। পুরনো পরিচয়ের কথা তুলে আমাকে আর বিরক্ত করো না!' দেখুন দেখি কাণ্ড! তাই ভাবছিলাম, আপনার দাদাও যদি এ-রকম..."

বাবা বললেন, "না, আমার দাদা হঠাৎ সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাবার মতন মানুষ নন। দাদাকে তো আমি চিনি!"

॥ ১৭ ॥

থানার বড়বাবু ইরানিকে দেখে বলে উঠলেন, "এই যে দিদিমণি, এসো, এসো! তোমার ভাইটি কোথায় গেল? সে আসেনি?"

থানায় ঢুকে বড়বাবুর সামনে ট্রেনের সেই লোকটাকে দেখে ইরানি এমনই অবাক হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় সে কোনো কথাই বলতে পারল না। লোকটি নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট টানছে। তার সামনে টেবিলের ওপর এক কাপ চা। দারোগাবাবু ওই লোকটাকে খাতির করে চা খাওয়াচ্ছেন? অথচ ইরানির নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, ওই লোকটা একটা ডাকাত। ও ট্রেনের খুদে ডাকাতদের জব্দ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে ও চলন্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল কেন?

ইরানি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বড়বাবু আবার বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন. ভাই, বোসো! এই তো চেয়ার আছে—।"

একজন কনস্টেবল একটা চেয়ার টেনে এনে দিল টেবিলের পাশে। কিন্তু ইরানি ট্রেনের লোকটার পাশে বসতে মোটেই রাজি নয়। লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতন মিটিমিটি হাসছে।

ইরানি বলল, "আমার ভাই…"

কথাটা শেষ করতে পারল না, হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ জ্বালা করে উঠেছে, গলার কাছে কেমন যেন একতাল বাষ্প জমা হয়েছে। কিন্তু ইরানি কিছুতেই কাঁদবে না এইসব লোকজনের সামনে। মেয়ে হলেই যে দুর্বল হতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু দিপু…দিপুটা হঠাৎ কোথায় চলে গেল…দিপুর যদি কোনো ক্ষতি হয় তা হলে মা-বাবাকে সে কী বলবে।

কান্নাটা চাপা দিতেই রাগ এসে গেল ইরানির। সে সোজা দারোগাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল, "আপনার…আপনারা এখানে থানা খুলে বসেছেন…আরাম করে চা খাচ্ছেন, আর এদিকে যে কত বিপদ ঘটে যাচ্ছে তার কোনো খবরই রাখেন না!"

বড়বাবু অবাক হয়ে ভুরু ও গোঁপ একসঙ্গে নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী! আবার কী বিপদ হল? তোমার জ্যেঠামশাইয়ের খোঁজ করবার জন্য কাছাকাছি কয়েকটা থানায় খবর পাঠিয়েছি!"

দারোগাবাবুর টেবিলের ওপর টেলিফোন দেখে ইরানি বলল, "আমি এক্ষুনি কলকাতায় ফোন করতে চাই!"

বড়বাবু একগাল হেসে বললেন, "ওটা যে মরে গেছে দিদিমণি!

মাঝে-মাঝেই ভাবি ওটাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখব ! ওটার কথা ছাড়ো, আবার কী নতুন বিপদ হল বলো দেখি ?"

ইরানি বলতে গেল "আমার ভাই..."

আবার সে থেমে গেল। দিপু যদি এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে ? মধু কিংবা কেষ্ট সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেবে বলেছিল।

ট্রেনের সেই লোকটা এবারে চেয়ার ঘুরিয়ে ইরানির দিকে পুরোপুরি ফিরে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভাই...ট্রেনে যাকে দেখেছিলুম ? সে তো খুব স্মার্ট ছেলে, কী হয়েছে তার ? হারিয়ে গেছে ?"

ইরানি দারোগাবাবুর দিকে চেয়েই বলল, "কাল রাত থেকে তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বড়বাবু বললেন, "রাত থেকে মানে ? কত রাত থেকে ? সন্ধেবেলাতেই তো আমি দেখে এলাম। এ-গ্রামে কি মানুষ চুরির ধুম পড়ে গেল ? আড়াই বছর এখানে পোস্টিং হয়ে গেল, কোনোদিন এমন কাণ্ড দেখিনি !"

ট্রেনের লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, সব খুলে বলো তো।"

ইরানি প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ? আপনাকে আমি বলতে যাব কেন ?"

লোকটি বলল, "আমার নাম খয়েরলাল। ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট, আর কিছু জানার দরকার নেই। তুমি দারোগাবাবুকেই সব কথা বলো। আমিও শুনি।"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, তুমি খয়েরলালের সামনে সব বলতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই।"

ইরানি কোনো মানুষের এমন অদ্ভুত নাম শোনেনি। খয়েরলাল ? লোকটা খুব পান খায়। হাওড়া স্টেশনে যখন লোকটাকে প্রথম দেখে, তখনও ঘ্যাস-ঘ্যাস করে পান চিবুচ্ছিল।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দিদিমণি, তোমার ভাইকেও চুরি করে নিয়ে গেল কী করে ? তখন তুমি কোথায় ছিলে ?"

ইরানি এবারে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে পড়ল, তার পা কাঁপছে।

যতবারই দিপুর কথা মনে পড়ছে ততবারই ধক-ধক করে উঠছে তার বুক।

মুখ নিচু করে ইরানি আস্তে আস্তে বলল, "রাত্তিরবেলা আমরা এক ঘরেই শুয়েছিলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কেউ দরজা ভাঙেনি। দিপু নিজেই একসময় উঠে গিয়েছিল বাইরে। তারপর আর..."

"ফেরেনি ? সকালবেলা ভাল করে খুঁজে দেখেছিলে ?"

"আমাকে কিছু না বলে তো ও কোথাও যাবে না ?"

"মাঝরাত্তিরে দরজা খুলে নিজে-নিজে বেরিয়ে গেল...নিশির ডাক নয় তো ? এদিকে শ্মশানের কাছে এক কাপালিক থাকে..."

বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভাইয়ের নাম দিপু ? পুরো নাম কী ?"

ইরানি বলল, "দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ক্লাস নাইনে পড়ে।"

"ওর কি প্রজাপতি ধরার শখ আছে ?"

"প্রজাপতি ধরা ? তার মানে ?"

"অনেক ছেলে প্রজাপতি খুব ভালবাসে। বড় প্রজাপতি দেখলে ধরতে যায়। প্রজাপতি ধরা কিন্তু খুব শক্ত। প্রজাপতির পেছনে ছুটতে-ছুটতে হয়তো তোমার ভাই মাঠের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে।"

"রাত্তিরবেলা প্রজাপতি ধরতে যাবে ?"

"রাত্তিরে কেন, ভোরবেলা বেরুতে পারে। ঠিক কখন যে ঘর থেকে বেরিয়েছে, তা কি কেউ জানে ?"

"আমাদের ঘরের সামনেই বারান্দায় একটা বাচ্চা ছেলে শোয়। সে খুব সকালে উঠেছে। সে দেখেছে দরজা খোলা।"

বড়বাবু বললেন, "তুমি একলা-একলা থানায় খবর দিতে এসেছ ? তুমি এই গ্রামে নতুন...তোমার সঙ্গে কেউ আসেনি ?"

ইরানি চুপ করে রইল।

"তোমাদের ওখানে রান্নার কাজ করে যে লোকটা, কী যেন নাম ? খুব চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলে ! তাকে যে আজ সকালে থানায় আসতে বলেছিলাম, সে এল না ?"

ইরানি দু' দিকে মাথা নাড়ল।

বড়বাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, "কেন এল না সে ? আমি তাকে হুকুম দিয়ে এসেছি।"

তারপর তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "দরওয়াজা !"

একজন কনস্টেবল বাইরে থেকে এসে ঠকাস করে জুতোয় শব্দ করে স্যালুট দিল। তারপর বলল, "স্যার ?"

বড়বাবু বললেন, "রামবাবুর বাগানে যে লোকটা রান্না করে, চেনো তাকে ? কী নাম তার ?"

কনস্টেবল বলল, "এককড়ি সাধু স্যার।"

"যাও, এক্ষুনি তাকে নিয়ে এসো ! মুখের কথায় আসতে না চায় তো ধরে নিয়ে এসো !"

"যো হুকুম, স্যার !"

ইরানি বলল, "সে ওখানে নেই।"

বড়বাবু বোমার মতন ফেটে পড়ে বললেন, "নেই ? এককড়ি ওখানে নেই ? কোথায় গেছে ? আমি তাকে থানায় আসতে বলেছিলুম..."

ইরানি বলল, "আজ সকালে সে চলে গেছে। সে থানা পছন্দ করে না !"

"পালিয়েছে ? ব্যাটা পালিয়েছে ? এতবড় সাহস ? ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ছেলে-ধরা দলের যোগ আছে। দরওয়াজা ! ছুটে যাও, যেমন করে পারো ওকে ধরে আনো, এর মধ্যে বেশিদূর যেতে পারবে না।"

ইরানি বলল, "এখান থেকে কলকাতায় খবর দেবার কোনো উপায় নেই ?"

বড়বাবু বললেন, "একটাই উপায় আছে। বাসে করে মেমারি চলে যাওয়া। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে চেপে হাওড়া। তারপর লঞ্চে চেপে কলকাতায় পৌঁছে যাকে যেমন খুশি খবর দিতে পারো।"

ইরানি বলল, "আমার ভাইকে এখানে ফেলে রেখে, মানে কোথায় সে গেছে তা না-জেনে আমি কলকাতায় চলে যাব ?"

খয়েরলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। চলুন বড়বাবু, আমরা আগে একবার অকুস্থলটা দেখে আসি। ক্লাস নাইনে পড়া একটি স্মার্ট, কলকাতার ছেলে তো গ্রামে এসে

এমনি-এমনি হারিয়ে যেতে পারে না !"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, চলুন, একবার অন দা স্পট এনকোয়ারি করে আসি !"

খয়েরলাল বলল, "তার আগে একটা প্রশ্ন, আপনি নিশি-ডাকের কথা কী বলছিলেন ?"

বড়বাবু বললেন, "নিশির ডাক কাকে বলে জানেন না ? এক একজন তান্ত্রিক যোগী আছে, তারা মাঝরাতে কোনো ছেলের নাম ধরে তিনবার ডাকে। অমনি সেই ছেলে ঘুমের ঘোরে বাইরে বেরিয়ে যায়। যোগীরা ধরে নিয়ে চলে যায় তাদের।"

"তারপর ?"

"তারপর মানে ?"

"যোগীরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কী করে ?"

"সে-সব আমি জানি না। শুনেছি যোগীরা কোনো ছেলেকে এরকম ডেকে নিয়ে গেলে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না !"

বড়বাবু হঠাৎ ইরানির দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, "না, না, মাঝে-মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়, সবাই হারিয়ে যায় না। আমরা পুলিশরা ওসব যোগী-টোগিদের গ্রাহ্য করি না ! একবার ক্যাঁক করে ধরতে পারলে গারদে ভরে দেব। একবার হয়েছিল কি জানো, আমি তখন মেদিনীপুরে···একজন সাধু সেখানে···"

খয়েরলাল বলল, "আপনার গল্পটা পরে শুনব। এখন চলুন যাওয়া যাক। আগে বাগানটা দেখে আসি। তারপর নদীর ধারে শ্মশানে কোন্ সাধু এসেছে তার কাছেও একবার যাওয়া যাবে।"

ইরানির দিকে ফিরে খয়েরলাল বলল, "সেই যে ট্রেনে তোমাকে বলেছিলুম না, আবার দেখা হবে ? তখন কিছু ভেবে বলিনি। কিন্তু সত্যি-সত্যি আবার দেখা হয়ে গেল। তোমার ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হবে নিশ্চয়ই !"

॥ ১৮ ॥

এই থানাতে কোনো জিপগাড়ি নেই। হেঁটে যেতে হলে তো অনেকটা সময় লেগে যাবে। থানায় দু' তিনটে সাইকেল আছে। বড়বাবু থেকে

কনস্টেবল সবাই সাইকেলেই যাতায়াত করে। বড়বাবু বললেন, "আমি আর খয়েরলাল দুটো সাইকেল নিই। দিদিমণিকে আমি বা খয়েরলাল ডাব্‌ল ক্যারি করতে পারি।"

ইরানি বলল, "আমি সাইকেল চালাতে পারি। আমি আলাদা যাব !"

বড়বাবু বললেন, "তুমি ? ইয়ে···মানে···এই গ্রামের রাস্তা দিয়ে তুমি তো চালাতে পারবে না, দিদিমণি ! এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা···"

ইরানি বলল, "ঠিক পারব ! কলকাতার রাস্তাও ভাঙা থাকে।"

বড়বাবু বললেন, "কিন্তু···মানে···গ্রামের লোক যে তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ?"

ইরানি রেগে গিয়ে বলল, "তা থাকুক না। যত ইচ্ছে দেখুক। তা বলে আমি সাইকেলের কেরিয়ারে চেপে যাব না। কিছুতেই যাব না !"

বড়বাবু বললেন, "এই রে, সাইকেল যে মোটে দুটো দেখছি। আর একটা সাইকেল আবার কোন্ ব্যাটা নিয়ে গেল !"

খয়েরলাল মিটিমিটি হাসছিল। এবারে সে পিচ্ করে খানিকটা পানের পিক ফেলে বলল, "আমি সাইকেল চালাতে জানি না !"

বড়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, "অ্যাঁ !"

তিনি একবার ইরানির দিকে আর একবার খয়েরলালের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর বললেন, "ওরে বাবা, তাহলে তো আমাকেই ক্যারি করতে হবে তোমাকে। টায়ার না ফেটে যায় !"

খয়েরলাল বলল, "আপনার একার ওজনে যদি টায়ার না ফাটে, তাহলে আমার একার ওজন আর কতটুকু ? আমি তো রোগা-পাতলা !"

এর পর বেশ মজার দৃশ্য হল। একটা সাইকেলে দু'জন বয়স্ক পুরুষ, আর একটাতে কিশোরী ইরানি।

আসবার সময় ইরানি রাস্তা চিনে গেছে, সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। তার দৃঢ় ধারণা হল, ফিরে গিয়েই দেখবে দিপু এসে গেছে। দিপুকে খুব একচোট বকুনি দিতে হবে। দিপু কেন এরকম চিন্তায় ফেলেছিল তাকে ?

গ্রামের লোকেরা সত্যিই হাঁ করে অনেকে দেখছে ইরানিকে। ইরানি অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করছে না। দেখুক যার যত ইচ্ছে। একটা কথা তার মনে হল. অবাক হলেই লোকের মুখ এরকম হাঁ হয়ে যায় কেন ?

গল্পে-উপন্যাসে সে পড়ে 'বিস্ফারিত চোখ' । কিন্তু সে-রকম চোখ তো সে দেখেনি কখনও ।

জ্যাঠামশাইয়ের বাগানের কাছে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে । তাহলে নিশ্চয়ই দিপু ফিরে এসেছে । ইরানি জোরে প্যাড্‌ল চালাল ।

না, দিপু আসেনি । কিছু গ্রামের লোক এসেছে বাগান থেকে কিছু কিনবার জন্য । তারা জানেই না যে, ক'দিনের মধ্যে এখানে কত কী ঘটে গেছে ।

সাইকেল থেকে নেমেই ইরানি মধুকে জিজ্ঞেস করল, "আসেনি ?"

মধু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কই, না । কত দিকে লোক পাঠালুম ।"

ইরানির যত রাগ হচ্ছে দিপুর ওপর । তার এখনও ধারণা, দিপুর কোনো বিপদ হয়নি, সে ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে ।

বড়বাবু আর খয়েরলালও এসে পড়ল একটু বাদেই । বড়বাবু প্রথমেই সবাইকে ধমকাতে লাগলেন, এককড়ি কেন পালিয়ে গেল সেইজন্য ! মধু আর কেষ্ট তো আকাশ থেকে পড়ল । তারা তো দেখেছে এককড়িকে ইরানির সঙ্গে থানায় যেতে ।

এককড়ির ব্যাঁকা-ব্যাঁকা কথা শুনে প্রথমে ইরানিরও বেশ বিরক্ত লেগেছিল লোকটির ওপরে । কিন্তু আজ সকালে একসঙ্গে যেতে-যেতে এককড়িকে তার বেশ পছন্দই হয়েছে । লোকটি অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু খারাপ নয় ।

বড়বাবু হম্বিতম্বি করতে লাগলেন আর খয়েরলাল কারুকে কিছু না জিজ্ঞেস করে লেবুবাগান, পেয়ারাবাগান সব ঘুরে দেখতে লাগল । পুড়ে যাওয়া পেয়ারাবাগানটার মাটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সে শুয়ে পড়ল দু'বার । পুকুরটাও চক্কর দিয়ে এল একবার । তারপর বলল, "নাঃ, এখান থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না । একজন বয়স্ক লোক আর একটি অল্পবয়স্ক ছেলে কেন এ-জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে ? ছেলেধরারা তো বুড়ো লোকদের ধরে না ? তবে নিশির ডাকের কথাটা একটু ভেবে দেখতে হয় !"

বড়বাবু বললেন, "যাঃ, ওটা তো কথার কথা বলেছি ! রামবাবু বুদ্ধিমান, বয়স্কলোক, তিনি নিশির ডাক শুনে বেরিয়ে যাবেন এ কখনও

হয় ?"

খয়েরলাল বলল, "চলুন না। একবার নদীর ধারে সাধুকে দেখে আসা যাক। এখানে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই।"

বড়বাবু ইরানিকে বললেন, "তুমি দিদিমণি তা হলে এখানেই থাকো। আমরা সাধুবাবার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।"

ইরানি বলল, "না, আমিও যাব।"

বড়বাবু এরই মধ্যে বুঝে গিয়েছেন যে, এই মেয়েটি জেদ ধরলে সহজে ছাড়বে না। তিনি আপত্তি করলেন না। অন্যদের বলে গেলেন, দিপু যদি এর মধ্যে ফিরে আসে কিংবা তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়, তাহলে কেউ যেন দৌড়ে নদীর ধারে গিয়ে খবর দিয়ে আসে।

এখান থেকে নদীর ধারে যাওয়ার সরাসরি কোনো রাস্তা নেই। যেতে হবে মাঠ ভেঙে। সুতরাং সাইকেল নিয়ে কোনো লাভ হবে না। সাইকেল দুটো ওখানেই রেখে ওরা হেঁটে চলল।

ইরানি কক্ষনো সম্পূর্ণ অচেনা লোকদের সঙ্গে এরকম হেঁটে কোথাও যায়নি। খয়েরলাল লোকটিকে এখনও সে বুঝতে পারছে না। লোকটা কে ? দারোগাবাবু ওকে খাতির করছেন কেন ?

দুটো মাঠ পেরুতেই নদী চোখে পড়ল। তেমন কিছু নয়, বেশ ছোট নদী। জল খুব কম। একটা মস্ত বড় ঝুপসি বটগাছের নীচে একটা ছোট্ট চালাঘর। তার সামনে ধুনির আগুন জ্বলছে। একজন গেরুয়া পরা সাধু বসে আছেন সেখানে, মাথায় চুলের জটা খোঁপা বাঁধা। আরও দু'তিনজন লোক বসে আছে সেই সাধুবাবার সামনে।

এই জায়গাটা বোধহয় শ্মশান। কিন্তু সে-রকম কিছু ভয়াবহ মনে হয় না। মড়ার মাথার খুলি বা হাড়-টাড় ছড়িয়ে নেই কোথাও। শিয়াল-কুকুরও নেই। এক কোণে কিছু পোড়া কাঠ পড়ে আছে, সেটাই বোধহয় চিতা।

বড়বাবু তাঁর দলবল নিয়ে সাধুবাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন না। তিনি একজনের হাত দেখছেন, মন দিয়ে তাই-ই দেখতে লাগলেন।

অন্য লোকেরা থানার দারোগাকে দেখে বেশ হকচকিয়ে গেছে।

যেখানে পুলিশ, সেখানেই গণ্ডগোল। নিরীহ লোকেরা তার ধারেকাছে থাকতে চায় না।

দারোগাবাবু একবার উঁ-হু-হু বলে গলা খাঁকারি দিলেন, তবু সাধুবাবা তা গ্রাহ্য করলেন না। খয়েরলাল সাধুবাবার ঘরটা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিল। একবার নেমে গেল জলের ধারে। তারপর ফিরে এসে ইরানির পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "ওই লোকটার হয়ে গেলে তুমি তোমার হাতটা একবার দেখাও তো।"

দারোগাবাবুর কাঁধ টিপেও সে সেই কথা জানাল।

যে-লোকটা হাত দেখাচ্ছিল, সে জিজ্ঞেস করছিল, তার জমি নিয়ে একটা মামলা চলছে, সেই মামলায় সে জিতবে কি না।

সাধুবাবা দু'হাত দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "নাঃ! অপরের জমি, তুমি জোর করে দখল করে নিতে চাও, তোমার লজ্জা করে না?"

লোকটির বোধহয় আরও অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু পুলিশ দেখে সে আর উৎসাহ দেখাল না। হাত সরিয়ে নিয়ে সে পিছিয়ে বসল।

খয়েরলাল এগিয়ে এসে বলল, "সাধুজি, এই মেয়েটির হাতটা একটু দেখে দিন না। এ বড় দুঃখী মেয়ে। আপনার প্রণামী আমরা দেব!"

সাধুবাবা এর উত্তরে কিছুই বললেন না, চুপ করে রইলেন।

খয়েরলাল ইরানিকে প্রায় জোর করেই বসিয়ে দিল সাধুবাবার সামনে। ইরানিও কেমন যেন হয়ে গেছে, সে নিজস্ব কোনো মতামত জানাতে পারল না।

সাধুবাবা ইরানির একটা হাত টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী জানতে চাও বলো মা?"

ইরানি কিছু বলবার আগেই খয়েরলাল বলল, "ও বড্ড বিপদে পড়েছে। আপনি একটু উদ্ধার করার ব্যবস্থা করে দিন।"

সাধুবাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী বিপদ তোমার মা?"

খয়েরলাল বলল, "আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি তো সবই জানেন। আপনি তো ওকে দেখেই বুঝবেন ওর কী বিপদ।"

এবারে সাধুবাবা মুখ তুললেন। কটমট করে তাকালেন খয়েরলালের দিকে। তারপর বেশ জোরে ধমকের সুরে বললেন, "তুমি ফড়ফড় করছ

কেন ? এ মেয়েটি কি বোবা, নিজের কথা নিজে বলতে পারে না ! চুপ করে থাকো !"

বড়বাবু দেখলেন, তাঁকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। তিনি পরে আছেন পুলিশের পোশাক, তাঁর সঙ্গেই তো সবার প্রথমে কথা বলা উচিত। এমনকী এই সাধুবাবা তাঁর সামনেই তাঁর শাগরেদকে বকে দিচ্ছে !

বড়বাবু বললেন, "এই যে, ইয়ে, সাধুবাবা, আমি এসেছি একটা এনকোয়ারি করতে..."

সাধুবাবা দারোগাবাবুর দিকেও কটমট করে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "আগে এই মেয়েটির হাত দেখব, না আপনার কথা শুনব ? কোন্‌টা চান বলুন !"

খয়েরলাল দারোগাবাবুর দিকে চোখ টিপে ইঙ্গিত করে বলল, "না, না, সাধুবাবা, আপনি ঐ মেয়েটির হাতটাই আগে দেখে নিন !"

সাধুবাবা ইরানির হাত দেখার আগে তার মুখখানি একদৃষ্টিতে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাতের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, "তোমার ভাই হারিয়ে গেছে। তুমি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে খুঁজবে, এই তো স্বাভাবিক। তুমি আমার কাছে এসেছ কেন, মা ?"

॥ ১৯ ॥

এমন সময় দেখা গেল কারা যেন হৈ হৈ করে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। ঠিক সামনে-সামনে লাফাতে-লাফাতে ছুটে আসছে একজন লোক, সে জোরে চিৎকার করে কী যেন বলছে। তার পেছনে-পেছনে আসছে ঘোমটা-পরা একজন বউ আর দু'তিনজন বাচ্চা। সামনের লোকটির খালি পা, একটা ধুতি মালকোচা মেরে পরা।

সাধুবাবা ইরানির হাত দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন, তা শুনে সবাই চমকে গিয়েছিল। তারপর কেউ কিছু বলার আগেই ঐ গোলমালটা খুব কাছে এসে পড়ল। সাধুবাবা মুখ তুলে সে-দিকে তাকালেন।

খালি-পায়ে লোকটি 'ওরে বাবা রে, মরে গেলুম রে, গা জ্বলে গেল রে, ওরে বাবা রে' বলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে এসে একেবারে হুড়মুড় করে

সাধুবাবার সামনে আছড়ে পড়ল। তারপর সাধুবাবার পা চেপে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, "বাঁচিয়ে দাও গো সাধুবাবা! দয়া করো। মরে যাচ্ছি! আর সহ্য করতে পারছি না!"

ইরানি যে সাধুবাবার সামনে বসে আছে, তা লোকটা গ্রাহ্যই করল না। লোকটা ইরানির গায়ে একবার ধাক্কা মারতেই ইরানি সংকুচিতভাবে সরে গেল খানিক দূরে।

সাধুবাবা গম্ভীরভাবে লোকটিকে বললেন, "আঃ, আমার পা ধরে টানছ কেন? উঠে বোসো! কী হয়েছে, ভাল করে খুলে বলো!"

লোকটি খানিকটা মুখ তুলে বলল, "সারা গা জ্বলে যাচ্ছে, আমি মরে যাব সাধুবাবা! বসতে পারছি না, শুতে পারছি না, মরে যাচ্ছি! আপনি আমাকে..."

হঠাৎ থেমে গেল লোকটি। সে দারোগাবাবুকে দেখতে পেয়েছে। এতক্ষণ তার মুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ছিল, এবারে সেখানে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ।

সে হাত জোড় করে বলল, "ক্ষমা করুন, দারোগাবাবু, দয়া করুন, আর কোনোদিন অপরাধ কবব না। যা করেছি তার জন্য মাপ করে দিন..."

দারোগাবাবু কোমরে দু'হাত রেখে বেশ জাঁদরেলভাবে লোকটিকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর ভুরু ও গোঁফ কাঁপছে। ঠোঁটটা হাসি-হাসি।

তিনি বললেন, "আগে যেন তোমায় দেখেছি-দেখেছি মনে হচ্ছে?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমার নাম দেবীদাস, আমি একবার মেয়াদ খেটেছি।"

বড়বাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক ধরেছি। ঠিক ধরেছি! ডাকাতির কেস, তাই না?"

দেবীদাস বলল, "আজ্ঞে না, সাইকেল-চুরি!"

বড়বাবু বললেন, "ঠিক-ঠিক! একবার মেয়াদ খেটেও তোর শখ মেটেনি। আবার পর পর বেশ কয়েকটা সাইকেল চুরির খবর পেয়েছি!"

দেবীদাস বলল, "আমি মরে যাচ্ছি, দারোগাবাবু, আমার চামড়া ফেটে যাচ্ছে, সারা গায়ে অসহ্য জ্বলুনি..."

বড়বাবু বললেন, "বেশ হয়েছে। পাপের শাস্তি!"

খয়েরলাল এবারে এগিয়ে এসে বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজে কি পাপের শাস্তি হয় ? এর থেকে ঢের বড়-বড় পাপী আমি দেখেছি...ওর কী হয়েছে আগে শোনা যাক !"

দেবীদাস মাটিতে শুয়ে পড়ে বলল, "আমি আর কথা বলতে পারছি না। ওঃ, ওঃ, ওঃ !"

ঘোমটা-মাথায় বউটি এবারে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো তাকিয়ে রইল ভয়-পাওয়া চোখে।

সাধুবাবা বললেন, "ওকে নদীর জলে স্নান করিয়ে নিয়ে এসো ! দ্যাখো তাতে যদি জ্বালা কমে।"

একটা বাচ্চা ছেলে বলল, "সকাল থেকে তিনবার চান করেছে ! পুকুরে ডুব দিয়েছে !"

সাধুবাবা তবু তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন লোকটির গায়ে। তারপর খানিকটা মাটি ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, শান্তি, শান্তি, শান্তি ! আর একটা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওর গায়ে।

দেবীদাস ছটফট করতে করতে হঠাৎ একেবারে থেমে গেল। ইরানি ভয় পেয়ে ভাবল, লোকটা মরে গেল নাকি ?

দেবীদাস একটু চোখ খুলে তাকাল। ফিসফিস করে বলল, "কমেছে, অনেকটা কমেছে।"

খয়েরলাল ওর পাশে উবু হয়ে বসল। তারপর ওর চোখের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "কাল রাতে কোথায় চুরি করতে গিয়েছিলে ? সেখানে বুঝি জলবিছুটি গাছ ছিল ? গায়ে বিছুটি লেগেছে ?"

দেবীদাস বলল, "আজ্ঞে না, বিছুটি লাগেনি।"

সাধুবাবা বললেন, "বিছুটি হলে তো জল দিলে আরও বেশি জ্বালা করত। কেউ বোধহয় ওকে বাণ মেরেছে !"

ইরানি ভাবল বাণ মানে তো তীর। লোকটার বুকে বা পিঠে তো তীর বিঁধে নেই। সে-রকম কোনো ক্ষতও নেই।"

দেবীদাস বলল, "হ্যাঁ সাধুবাবা, বাণ মেরেছে ! একটা ছোট ছেলে !"

দারোগাবাবু বললেন, "অ্যাঁ ? ছোট ছেলে ? কত ছোট ?"

খয়েরলাল বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, গোড়া থেকে সব শুনতে হবে। ওহে দেবীদাস, কাল রাতে কোথায় চুরি করতে গিয়েছিলে সেটা বললে না তো ? একদম সত্যি কথা বলবে। সাধুবাবা মন্ত্র পড়ে তোমার ব্যথা কমিয়ে দিয়েছেন, তুমি মিথ্যে কথা বললেই তিনি মন্ত্র ফিরিয়ে নেবেন।"

সাধুবাবা লোকটির কপালে আর-একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "এবারে উঠে বসো।"

লোকটি দারুণ অবাকভাবে সাধুবাবার দিকে তাকাল। মাত্র দু'তিন মিনিট আগেও সে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, এখন আর তার কোনো ব্যথা নেই।

লোকটি উঠে বসতেই খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ, তারপর ?"

দেবীদাস একবার ঢোক গিলে বলল, "কাল রাতে রামবাবুর বাগানে গিয়েছিলাম, পুকুরের ধারটায়…"

বড়বাবু বললেন, "রামবাবুর বাগানবাড়ি থেকে ক'দিন আগেই একটা সাইকেল চুরি গেছে। সেটা তোমারই কীর্তি। আবার গিয়েছিলে আরও কিছুর খোঁজে ?"

খয়েরলাল বলল, "আহা, আপনি যেমন রোজ অফিস যান, তেমনি ওকেও কাজে বেরুতে হয়। তারপর ? পুকুরধারে কী হল ?"

দেবীদাস বলল, "পুকুরধারে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। সেই যে পুকুরটার সব জল শুকিয়ে গেছে, সেই পুকুরটার ধারে।"

খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "রাত তখন ক'টা ?"

"তা বারোটা-একটা হবে ! জানেনই তো ওই জায়গাটায় যখন-তখন ঝড়বৃষ্টি হয় !"

"যখন-তখন ঝড়বৃষ্টি হয়, শুধু ঐ জায়গাটায় ? তার মানে ?"

"আপনি নতুন লোক, তাই জানেন না। আশপাশের সব গ্রাম শুকনো, খটখটে, অথচ এখানে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, এমন তো প্রায়ই হয়।"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, এদিকটায় একটু বেশি বৃষ্টি হয় বটে। বড় অদ্ভুত ব্যাপার।"

খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "তারপর ?"

দেবীদাস বলল, "কাল সন্ধেবেলাতেও তেমনি হয়েছিল। আমি গেলুম

বৃষ্টি থামবার পর। ওখানকার যে রান্নার ঠাকুর, সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, তার ঘরে আলো জ্বলে। সেইজন্য আমি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলুম। তারপর একসময় একটা খোকা বেরিয়ে এল, তার হাতে একটা টর্চ না কী যেন ছিল, ঠিক দেখতে পাইনি, তবে গোলমতন আলো জ্বলছিল...”

বড়বাবু ইরানির দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই তো, তোমার ভাইয়ের কথা বলছে। আমি ঠিক বুঝেছিলুম, এই ব্যাটাই সব গণ্ডগোলের মূলে!”

খয়েরলাল হাত তুলে দারোগাবাবুকে চুপ করার ইঙ্গিত করে বলল, “তারপর?”

দেবীদাস বলল, “সেই খোকাটা জাদু-মন্তর জানে বোধহয়। অতটুকু ছেলে, কিন্তু একটু ভয় নেই! আমার ওপর কী যে একটা আলো ফেলল, অমনি আমার গায়ে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। আমি আর তিষ্ঠোতে পারলুম না।”

দারোগাবাবু বললেন, “ঠিকই তো করেছে সে, তোর উচিত-শাস্তি হয়েছে।”

দেবীদাস বলল, “ও ছেলে আলো দিয়ে বাণ মারতে জানে!”

ইরানি বলল, “না, দিপু তো সে-রকম কিছু জানে না। দিপু টর্চ নিয়েও বেরোয়নি।”

খয়েরলাল বলল, “ছেলেটা তোমাকে বাণ মারল, তুমি তাকে কিছু বললে না? তুমি তাকে উল্টে কিছু দিয়ে মারোনি?”

দেবীদাস বলল, “আজ্ঞে না হুজুর! আমি তখন নিজের জ্বালায় জ্বলছি, এক দৌড়ে পালিয়ে গেলুম!”

বড়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, “সত্যি কথা বল্ ব্যাটা! তুই ছেলেটাকে কী করলি?”

দেবীদাস হাত জোড় করে বলল, “সত্যি বলছি, হুজুর! মা কালীর দিব্যি! আমি সে-ছেলের গায়ে হাতও ছোঁয়াইনি!”

“তা হলে সে-ছেলে গেল কোথায়?”

“কেন? সে-ছেলে ও-বাড়িতে নেই?”

“না!”

সাধুবাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আবার মেঘ জমেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে!"

খয়েরলাল সাধুবাবার দিকে ফিরে বলল, "এবারে বলুন তো সাধুবাবা, আপনি এই মেয়েটিকে দেখেই কী করে বললেন, ওর ভাই হারিয়ে গেছে? কাল রাত্তিরে ওর ভাই হারিয়ে গেল আর আজ সকালেই ওর হাতের রেখায় সে-কথা ফুটে উঠল?"

সাধুবাবা বললেন, "হাত দেখে বলিনি, ওর মুখ দেখে বুঝেছি।"

খয়েরলাল আবার জিজ্ঞেস করল, "ওর যে একটি ভাই আছে, সেটা আপনি কী করে জানলেন?"

সাধুবাবা বললেন, "আমি কী করে কী বুঝি, তা তোমাকে বোঝাব কী করে?"

এমন সময় প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাতের শব্দ হল। তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি। ঝড়েরও শোঁশোঁ শব্দ উঠল।

সাধুবাবার ছোট্ট ঘরখানা ছাড়া কাছাকাছি আর কোথাও আশ্রয় নেওয়ার উপায় নেই। সবাই সেই ঘরের মধ্যেই ঢুকল। দেবীদাসের ছেলেমেয়ে দুটিকে শুধু দেখতে পাওয়া গেল না। বাবাকে সুস্থ হয়ে যেতে দেখে তারা নদীর ধারে খেলতে চলে গেছে এর মধ্যে। দেবীদাস তার ছেলেমেয়েকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল, দারোগাবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন, "উঁহু, তুমি যাবে না। পালাবার মতলব করলে একেবারে মাথা গুঁড়ো করে দেব!"

খয়েরলাল বলল, "আমি ডেকে আনছি বাচ্চা দুটোকে।"

খয়েরলাল ওদের আনতে আনতেই ভিজে গেল একেবারে। তারপরেই যেন শুরু হয়ে গেল প্রলয়কাণ্ড। যেমন ঝড়, তেমন বৃষ্টি। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছে সাধুবাবার ছোট্ট ঘরখানা আকাশে উড়ে যাবে। সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল মাঝখানটায়। এত জোর শব্দ হচ্ছে যে, কথা বলারও উপায় নেই। দারোগাবাবুর মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। শুধু সাধুবাবার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি।

॥ ২০ ॥

দিপুর মনে হল, সে যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর জেগে উঠল। খুব আরাম লাগছে শরীরে। কোথা থেকে যেন ফুরফুরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। দিপু চোখ মেলে আকাশ দেখতে পেল। ঝিকমিক করছে অনেক তারা। আকাশ দিয়ে কী যেন উড়ে যাচ্ছে। আবছা, সাদা-সাদা মতন।

দিপু কোথায় শুয়ে আছে? সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একটা কোনো উঁচু ছাদ। কিন্তু পাঁচিল নেই, চারধারটা খোলা। আর-কোনো লোক নেই। দিপুর ভুরু কুঁচকে গেল। এটা কোন্ জায়গা? সে এখানে এল কী করে? সে তো বর্ধমানের ঘোড়াডাঙা গ্রামে গিয়েছিল, জ্যাঠামশাইয়ের বাগানে। সেখানে তো কোনো পাকা বাড়ি ছিল না? দিদি কোথায় গেল?

তারপর দিপু ভাবল, সে নিশ্চয়ই এখনও ঘুমিয়ে আছে আর স্বপ্ন দেখছে। সে নিজের গালে জোরে একটা চিমটি কাটল। না, স্বপ্ন নয় তো, চিমটিতে বেশ লাগছে।

দিপু উঠে বসল। সত্যিই কোনও বেশ উঁচু আর পুরনো বাড়ির ছাদে সে ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। এটা কার বাড়ি?

দিপুর এবারে একটু-একটু করে মনে পড়ল। মাঝরাতে দিদিকে কিছু না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কে যেন ডাকছিল তাকে। কেউ চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকেনি, দিপুর খালি মনে হচ্ছিল কেউ তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা গোলমতন আলো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পুকুরধারে দেখা হল একজন মানুষের সঙ্গে। ফরসা মুখখানা, মাথাটা চকচকে, একটাও চুল নেই। লোকটিকে দিপু আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু দেখা মাত্র লোকটিকে ভাল লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর?

দিপু তো কোনও সিঁড়ি দিয়ে ওঠেনি, তা হলে এই ছাদে উঠে এল কী করে? সে তো কোনও সিঁড়ি ভাঙেনি! এত উঁচু একটা ছাদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলে তা তার মনে থাকবে না?

দিপু আস্তে আস্তে গিয়ে ছাদের একপাশে উঁকি মারল। তাকিয়েই তার মাথা ঘুরে গেল প্রায়। অনেক নীচে টলটল করছে জল। সেই জলে দুটো হাঁস ভাসছে। এত ওপর থেকে মনে হচ্ছে একরত্তি পুতুলের মতন।

দিপু এবারে একটু ভয় পেয়ে গেল। এটা তো বাড়ি নয়। এটা তো একটা গম্বুজ। এখানে কে তাকে আনল!

সে আবার মুখ ফেরাতেই দেখল পাশে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফর্সা মুখ, চকচকে টাক-মাথা। ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসি।

দিপুর বুকটা ধক্ করে উঠল একবার। লোকটি তো এখানে ছিল না, কী করে এল?

কিন্তু লোকটির মুখ দেখে দিপুর ভয় কেটে গেল। এই রকম মানুষ দেখলেই মনে হয় এদের কাছ থেকে কোনো আঘাত আসতে পারে না।

প্রথম দেখার সময় লোকটির গায়ে কী রকম পোশাক ছিল তা দিপুর ঠিক মনে নেই। এখন ওর গায়ে একটা পাতলা গেরুয়ার আলখাল্লা।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ, দিপু? ভাল ঘুম হচ্ছে তো?"

দিপু বলল, "আপনি···আপনি কে?"

লোকটি বলল, "কেন, আমায় চিনতে পারছ না? আগে দেখোনি আমায়?"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু আপনি কে তা তো জানি না!"

লোকটি একটুক্ষণ চিন্তা করতে লাগল। তারপর আপনমনে বলতে লাগল, "আমার একটা নাম থাকা দরকার, তাই না? ঠিকই তো, নইলে আমায় ডাকবে কী করে? তা হলে ধরো আমার নাম ডমরুনাথ।"

দিপু বলল, "ধরো বলছেন কেন? এটা আপনার আসল নাম নয়? আপনার অন্য নাম আছে?"

লোকটি বলল, "আমার অনেকগুলো নাম। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। তুমি আমাকে ডমরুনাথ বলেই ডেকো। কিংবা ডমরুজি।"

নাম নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করল না দিপুর। সে জিজ্ঞেস করল, "আমি এ কোথায় এসেছি?"

ডমরুজি বলল, "তুমি···তুমি একটা আমবাগানে শুয়ে আছ।"

"আমবাগান ? কী বলছেন আপনি ? এটা তো গম্বুজের চূড়া !"

ডমরুজি তার ঠোঁটের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা তো তুমি স্বপ্ন দেখছ। আমাকেও তুমি স্বপ্নেই দেখছ, জানো তো ?"

দিপু বলল, "স্বপ্ন ? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। আমি চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগছে।"

"স্বপ্নে বুঝি ব্যথা লাগে না ? স্বপ্ন দেখে কত লোক ভয় পেয়ে কাঁদে তা জানো ?"

"আমি আর স্বপ্ন দেখতে চাই না। আপনি আমার স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিন !"

"ঠিক আছে !"

ডমরুজি ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিপুর দু' চোখ ঢেকে দিল।

তারপরেই দিপু আবার চোখ মেলে দেখল দিনের আলো ঝলমল করছে। তার মাথার ওপর একটা মস্ত আমগাছ ডালপালা মেলে আছে। পাখি ডাকছে। অনেক দূরে একটা গোরুর ডাকও শোনা গেল।

এখানেও তার পাশে বসে আছে ডমরুজি। কিন্তু তার গায়ের আলখাল্লাটার রং সাদা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

দিপু এত অবাক হয়ে গেছে যে, কথা বলতে পারছে না।

ডমরুজি মিষ্টি করে বলল, "কী দিপু, ওঠো। সকাল হয়ে গেছে। আর কত স্বপ্ন দেখবে !"

দিপু ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল, সত্যিই সে একটা আমবাগানে শুয়ে ছিল। কোথায় সেই গম্বুজ, কোথায় সেই জলের ওপর পুতুলের মতন হাঁস ! এই আমবাগানেই বা সে এল কী করে ?

ডমরুনাথ বলল, "আমার সঙ্গে কিন্তু তুমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছ। আমি তোমায় ধরে আনিনি, মনে আছে তো ?"

দিপু ঘাড় হেলাল।

"তুমি ঘুমের ঘোরে বাইরে চলে এসেছিলে। পুকুরধারে আমার সঙ্গে যখন তোমার দেখা হল, তখনও তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। স্বপ্নের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হল। আমি তোমার স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিলুম। তারপরেও তুমি আমার সঙ্গে আসতে চাইলে, মনে পড়ে ?"

দিপু আবার মাথা হেলাল। তার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু এই

লোকটি যে সত্যি কথা বলছে, তাতেও তার কোনও সন্দেহ নেই।

ডমরুনাথ আবার বলল, "তুমি যে আমার সঙ্গে চলে এসেছ, এখানে তোমাকে ঘন ঘন স্বপ্ন দেখতে হবে। আমি বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারি না।"

"তার মানে?"

"সে অনেক ব্যাপার। তোমাকে এক কথায় তো বোঝানো যাবে না। পরে একটু একটু করে বুঝবে। তোমার বাড়ির জন্য মন কেমন করছে? তোমার দিদি তোমার জন্য চিন্তা করবে।"

"আপনি কে?"

"আমার নাম যে বললুম তোমাকে। ডমরুজি বলে ডাকবে।"

"নামটা তো জানলুম। কিন্তু আপনি কে? আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?"

"নাম জানা আর শক্ত কী বলো। অন্য কেউ তোমার নাম ধরে ডাকলেই তো সেটা আমি শুনে নিতে পারি।"

"আপনাকে আমি আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু খুব চেনাচেনা লাগছে।"

"বোধহয় আগে কখনও স্বপ্নে দেখেছ। তা ছাড়া তোমার চোখটা অন্য রকম। তুমি এমন অনেক কিছু দেখতে পাও, যা অন্যরা পায় না। তাই না?"

"হ্যাঁ, এরকম হয়। সে-কথা আমি অন্য কারুকে বলতে পারি না।"

"তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। তুমি যে আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছ, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। অনেকেই আমাকে দেখলে ভয় পায়।"

"কেন, আপনাকে দেখলে ভয় পাবে কেন?"

"ভাবে, আমি বুঝি কোনও অলৌকিক প্রাণী। আর অলৌকিক হলেই ভয়ের ব্যাপার।"

"আপনি ঠিক কে, তা আমিও এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার ভয় করছে না।"

"তুমি যে অন্যরকম! আমি কে, তা পরে জানলেও চলবে। এখন

একটা দরকারি কথা শোনো। তুমি আর তোমার দিদি তোমাদের জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে এসেছ তো ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কোথায় আছেন আমি জানি। কিন্তু তিনি ফিরে যেতে চাইছেন না।"

"ফিরে যেতে চাইছেন না ?"

"না। সেটাই তো মুশকিল। খুব তীব্রভাবে ফিরতে না চাইলে কেউ যে ফিরতে পারে না এখান থেকে। তুমি তোমার জ্যাঠামশাইকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করবে ?"

"আমার বাবা যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। জ্যাঠামশাইয়ের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি জানেন তিনি কোথায় আছেন ?"

"তুমি যাবে সেখানে ?"

"এক্ষুনি !"

"ভালই হল। আমি তো আর এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারতুম না। সেখানে চলো, সেখানেই আবার তোমার সঙ্গে কথা হবে। ওই দ্যাখো, ঝড় উঠে গেল। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। এই এক ঝঞ্ঝাট আমাকে নিয়ে।"

"হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি ! সেটা আপনার জন্য ?"

"ওসব কথা পরে। চোখ বোজো !"

দিপু চোখ বুজল। তারপর যেন আবার অনেক সময় কেটে গেল। দিপু এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, সে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

সে দেখতে পাচ্ছে একটা নদী। তার তীরে একটা বাঁধানো ঘাট। নদীর জলে ঢেউ উঠছে ঘন ঘন। জলের ওপর রোদ পড়ে চিকচিক করছে। কয়েকটা চিল ঘুরে-ঘুরে ডাকছে।

ঘাটের কাছে জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে একজন মানুষ। দেখা মাত্র দিপু চিনতে পারল তার জ্যাঠামশাইকে।

॥ ২১ ॥

দিপু যেন আকাশ থেকে আস্তে আস্তে নীচে নামছে। ঠিক প্লেন থেকে প্যারাশুটে নামার মতন, যদিও দিপুর মাথায় প্যারাশুটের ছাতা নেই।

দিপুর ঠিক পায়ের তলাতেই নদী। যদিও নদীতে বেশি জল নেই, তবু সে নদীতেই পড়বে। দিপু একটু-একটু বুঝতে পারছে এ-সবই সে স্বপ্নে দেখছে. এখন তার কোনও বিপদ হবে না।

কিন্তু নদীর খুব কাছাকাছি এসে দিপুর শরীরটা দুলতে লাগল। যেন সুতো দিয়ে ঘুড়ি টানার মতন কেউ তাকে অন্যদিকে টানছে। জলের ওপর থেকে সরে গিয়ে দিপু চলে এল পাড়ের দিকে। তারপর তার শরীরটা একটা গাছে আটকে গেল।

সেই গাছের ডাল ভাল করে ধরবার আগেই দিপু ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এবারে বেশ জোরে। তার পায়ে ব্যথা লাগল. সে উফ্ করে শব্দ করল।

ডমরুজি তো ঠিকই বলেছিলেন, স্বপ্নেও ব্যথা লাগে।

দিপুর উফ শুনে নদীর ধারে পা-ঝুলিয়ে বসে থাকা জ্যাঠামশাই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, "এই দিপু, এদিকে আয়, তাড়াতাড়ি আয়, জলের মধ্যে তাকিয়ে দ্যাখ!"

জ্যাঠামশাই দিপুকে দেখে একটুও অবাক হলেন না! এমন ভাবে কথা বললেন, যেন দিপুর সঙ্গে তাঁর খানিকটা আগেও দেখা হয়েছে।

দিপু জ্যাঠামশাইয়ের কাছে চলে আসতেই তিনি বললেন, "দ্যাখ্, দ্যাখ্, কী সুন্দর!"

দিপু নদীর জলের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না।

জ্যাঠামশাই বললেন, "ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ। দু'রকম রং দেখতে পাচ্ছিস না? আমরা সব সময় এক-এক জায়গার জলে শুধু একরকম রং দেখি, তাই না? এখানে দ্যাখ নদীর জলে দুরকম রং।"

দিপু প্রথমে ভাবল জলের আবার রং কী? সমুদ্রের জল নীল রঙের দেখায় বটে, কিন্তু বাকি সব জল তো শুধু জল-রং!

সে বলল, "জ্যাঠামশাই, আমি তো কোনও রং দেখতে পাচ্ছি না?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "পাচ্ছিস না? ও, তুই একেবারে নতুন এসেছিস তো. তোর চোখ এখনও ঠিক খোলেনি। হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওপরে হালকা সবুজ-সবুজ জল, তার নীচে একেবারে গাঢ় হলুদ। ওই যে একটু দূরে একটা বক বসে আছে, ওটার রং

তুই কী দেখছিস ?"

দিপু বলল, "সাদা !"

জ্যাঠামশাই বললেন, "এঃ হে, তোর তো চোখ তাহলে একেবারেই খোলেনি। সাদা রঙের মধ্যে সাতটা রং লুকিয়ে থাকে জানিস তো ?"

দিপু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সাদা রঙের মধ্যে না কালো রঙের মধ্যে ?"

জ্যাঠামশাই সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "আমি ওই বকটার গায়ে পরিষ্কার সাতটা রং দেখতে পাচ্ছি। ঠিক রামধনুর মতন। বকটা একটা রামধনু-রঙের জামা পরে আছে। এটাই তো এখানে আসার মজা !"

এবারে দিপু একটু ভয় পেয়ে গেল। জ্যাঠামশাই এসব কী কথা বলছেন ? উনি পাগল হয়ে যাননি তো ?

এই সময় আর একটি লোক নদীর ঘাটের দিকে নেমে এল। দিপু তাকিয়ে দেখল সে লোকটা ডমরুজি নয়। একজন অচেনা মানুষ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা, বুকে পৈতে।

লোকটি দিপুর কাছ ঘেঁষে চলে গেল, দিপুকে দেখতে পেল না। সে জ্যাঠামশাইয়ের দিকেও তাকাল না। জলে নেমে পা ধুতে লাগল।

জ্যাঠামশাই বললেন, "লোকটা জল ভাঙছে, দেখছিস ? কাচ যেমন ভাঙে, সেরকম জলও ভাঙে। দ্যাখ কী রকম গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।"

দিপু সেদিকে নজর দিল না, সে অবাক ভাবে চেয়ে রইল পৈতে-পরা লোকটির দিকে। জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনেও লোকটি ফিরে তাকাল না ? ও কি জ্যাঠামশাইয়ের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ?

জ্যাঠামশাই বললেন, "তুই আমায় পাগল ভাবছিস তো ? প্রথম-প্রথম ও-রকম হয়। আমি নিজেকেই পাগল বলে সন্দেহ করেছিলুম। এখন সব বুঝেছি। তুই যা ভাবছিস ঠিক তাই। ওই লোকটা আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না, আমাদের কথা শুনতেও পাচ্ছে না। আমরা তো স্বপ্নের মধ্যে এখানে এসেছি, কিন্তু ও-লোকটা সত্যি সত্যি এসেছে। স্বপ্ন আর বাস্তব, পাশাপাশি, বুঝলি ?"

দিপু চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারছে না।

আবার সে চমকে উঠল। কোথা থেকে হঠাৎ এসে উদয় হলেন সেই মানুষটি, সেই গোলগাল চেহারা, চকচকে টাক-মাথা। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। শুধু তাই নয়, ইনি দাঁড়িয়ে আছেন জলের ওপর।

ডমরুজি বললেন, "এই দ্যাখো দিপু, তোমার জ্যাঠামশাই ফিরতে চাইছেন না।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না, না, না, না, ফেরার কথাই ওঠে না। দিপু বুঝি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে?"

দিপু বলল, "বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অনেকদিন আপনার কোনও খবর পাননি!"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ওই তো মুশকিল। এখান থেকে কিছুতেই খবর পাঠানো যায় না। এই যে লোকটা জলে পা ধুচ্ছে, তুই ওর সামনে গিয়ে হাজার গলা ফাটিয়ে চিৎকার কর, তবু ও তোর কথা শুনতে পারবে না। এখান থেকে চিঠিও লেখা যায় না। তোর বাবা ক'দিন একটু চিন্তা করবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। মরে যাওয়ার চেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল, তাই না? ভাববে কোনও একদিন ফিরে এলেও আসতে পারে।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "এখন ফিরে যাবেন না কেন? এটা কোন্ জায়গা?"

জ্যাঠামশাই আর ডমরুজি দু'জনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন।

জ্যাঠামশাই বললেন, "এটা কোনও জায়গাই নয়! আমরা তো কোনও জায়গায় থাকি না। আমরা একটা স্বপ্ন থেকে আর একটা স্বপ্নতে চলে যাই।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "আমরা কতক্ষণ স্বপ্ন দেখব? জাগব না? আমাদের খিদে-টিদে পাবে না?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ওসব কিছু চিন্তা নেই রে এখানে। স্বর্গ কাকে বলে জানিস তো? আকাশের ওপারে যে স্বর্গ — সেখানে কোনদিন যাব কি না জানি না, কিন্তু এই যে স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি, এখানকার সুখ স্বর্গের চেয়ে কিছু কম নয়। সবই এই দীনবন্ধুর দয়াতে হয়েছে।"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "দীনবন্ধু কে?"

ডমরুজি বললেন, "ওটাও আমারই নাম। শোনো, দিপু, তোমার জ্যাঠামশাই খুব খুশি মনে এখানে আছেন বটে, কিন্তু আমি মোটেই এই অবস্থায় থাকতে চাই না। আমি ফিরে যেতে চাই। মুশকিল এই, আমি মাঝখানে আটকে গেছি, কিছুতেই ফিরতে পারছি না। মহাভারতে অভিমন্যুর কাহিনী মনে আছে তোমার ? অভিমন্যু যেমন চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর বেরুতে পারেননি, আমারও হয়েছে সেই দশা।"

জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, "বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। ভাগ্যিস আপনার এরকম হয়েছিল, তাই আমরাও এরকম মজা করতে পারছি !"

ডমরুজি বললেন, "দিপু, তোমার জ্যাঠামশাইয়ের কিন্তু সে-অবস্থা নয়। অর্থাৎ আমার মতন নয়। উনি ইচ্ছে করলে ফিরতে পারেন। কিন্তু উনি যে ফিরতে চাইছেনই না। বেশিদিন থাকলে শেষ পর্যন্ত ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে !"

জ্যাঠামশাই বললেন, "যাক বন্ধ হয়ে। ফিরে গিয়ে কে আবার টাকাপয়সার হিসেব, চালডালের হিসেব আর পেয়ারালেবুর হিসেব করতে চায় ?"

হঠাৎ আকাশটা কালো হয়ে মেঘের গুরুগুরু শোনা গেল।

ডমরুজি বললেন, "আমার এখানে সময় হয়ে গেছে। এই এক জ্বালা। সর্বক্ষণ দৌড়োদৌড়ি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না আমবাগানে ফিরবে ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "আপনার সঙ্গে যাব ! আপনার সঙ্গে..."

ডমরুজি নিচু হয়ে খানিকটা জল তুলে ছিটিয়ে দিলেন ওদের দু'জনের গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে দিপুর চোখ বুজে এল, সে বুঝতে পারল আবার সে দুলতে-দুলতে কোথাও চলে যাচ্ছে। সত্যি-সত্যি যাচ্ছে না, স্বপ্নের মধ্যে। এক স্বপ্ন থেকে আরেক স্বপ্নের দিকে যাত্রা।

একটু পরেই আবার আপনা-আপনি দিপুর চোখ খুলে গেল। এবারে সে দেখতে পেল একটা রাস্তা। দু'পাশে পর পর বাড়ি। কোনও বাড়ির নীচে দোকানঘর। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, সাইকেল-রিকশা, মোষের গাড়ি, অনেক রকম শব্দ। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, এটা স্বপ্ন।

ঠিক মনে হচ্ছে যেন কোনও ছোটখাটো শহরের রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

দিপু কাছাকাছি কোথাও জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেল না। ডমরুজিকেও না। এখানে সে একা-একা এল কেন? এরপর সে কী করবে?

রাস্তার কোনও লোক তার দিকে তাকাচ্ছে না। দিপু তাহলে অদৃশ্য মানুষ? সে 'দা ইনভিজিব্‌ল ম্যান' নামে একটা বই পড়েছিল, যাতে একজন বৈজ্ঞানিক অদৃশ্য হবার উপায় শিখে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা কাচের মতন হয়ে গিয়েছিল। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে তিনি একটা হোটেলে না গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। সেই লোকটির জীবন তো খুব দুঃখের!

তারপর দিপু বুঝতে পারল, সে শুধু সিনেমার মতন এই রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে। সে নিজে এখানে নেই। সে শুয়ে আছে অন্য কোথাও। রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে, অথচ তার গায়ে লাগছে না, এ কখনও হয়?

এবারে তার পাশেই ডমরুজিকে আবার হাজির হতে দেখে দিপু একটুও অবাক হল না।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "জ্যাঠামশাই কোথায়?"

ডমরুজি বললেন, "তিনি তো অন্য স্বপ্নতে চলে গেলেন। তোমরা দু'জনে তো একসঙ্গে একটা স্বপ্ন দেখোনি?"

"জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হবে না?"

"হতে পারে। আবার দু'জনে কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় আসতে পারো।"

"আমায় জাগিয়ে দিন।"

"হ্যাঁ, সেই কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তোমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তো কথা বলে দেখলে। উনি গোঁয়ার্তুমি করছেন, যেতে চাইছেন না। তুমি ফিরে যাবে? তাহলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"আমি একা ফিরে যাব?"

"হ্যাঁ। তাছাড়া আর উপায় কী!"

দিপু মাথা নেড়ে বলল, “না, জ্যাঠামশাইকে খোঁজার জন্যই তো এসেছি। ওঁকে না নিয়ে আমি কিছুতেই ফিরে যাব না!”

ডমরুজি ব্যস্তভাবে বললেন, “উহুঃ, উহুঃ, অত জোর দিয়ে না-ফেরার কথা বলতে নেই। তাতে বিপদ হতে পারে।”

॥ ২২ ॥

দিপু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, “আমরা এখানে এলাম কেন ? এই রাস্তায় কী দেখবার আছে ?” ডমরুজি হাসলেন। তারপর বললেন, “এমনিতে এ-রাস্তাটাতে দেখার কিছুই নেই। দেখতেও সুন্দর নয়। তা ছাড়া বড্ড লোকজনের ভিড় আর গোলমাল, তাই না ? কিন্তু ওই দিকে তাকিয়ে দেখো তো, কিছু মনে পড়ে কি না ?” ডমরুজি একদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। সেখানে একটা মোটর গারাজ। দু'তিনটে ভাঙাচোরা গাড়ি রাস্তার ওপরে পড়ে আছে। সেখানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন লম্বা চেহারার মানুষ মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে ঠিক সেই সময় পেছন ফিরে. তাকাল।

দিপু চমকে উঠে বলল, “ডাক্তারকাকা ! উনি এখানে কী করছেন ?”

ডমরুজি বললেন, “চলো, আর একটু কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক।”

এত ভিড়ের মধ্যেও ওদের এগিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হল না। কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না, কারুর গায়ে ধাক্কা লাগছেও না।

মোটর গারাজের খুব কাছাকাছি এসে দিপু আবার চমকে উঠল, সে ডেকে উঠল, “বাবা !”

সত্যি একটা কাঠের টুলে বসে আছেন দিপুর বাবা। মুখে খানিকটা ক্লান্তির ছাপ। তিনিও ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন, আর কথা বলছেন পাশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।

দিপু নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বাবা, ডাক্তারকাকা এই একটা অচেনা শহরে কী করছেন ? বাবার অসুখ সেরে গেলেও এখানে আসবেন কেন ? আর ডাক্তারকাকা অত ব্যস্ত মানুষ !

দিপু ছুটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই ডমরুজি মুচকি হেসে বললেন,

"কোনও লাভ নেই ! কোনও লাভ নেই ! তুমি তো ওঁদের স্বপ্নে দেখছ !"

দিপু থেমে গিয়ে বলল, "ও ! স্বপ্নে তো অনেক কিছু উল্টোপাল্টা দেখা যায়। বাবা তা হলে বাড়িতেই আছেন।"

"উঁহু ! উনি এখানেই এসেছেন।"

"আপনি কী যে বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার বলছেন স্বপ্ন, একবার বলছেন সত্যি !"

"তোমার আর তোমার দিদির কোনও খোঁজ না পেয়ে তোমার বাবা-মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই ওঁরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিলেন তোমাদের খোঁজে।"

"আমাদের খোঁজে ওঁরা এখানে আসবেন কেন ?"

"ওঁরা আসছিলেন পুলিশের একটা জিপগাড়িতে। ওই যে তোমার বাবা যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি পুলিশ অফিসার। রাস্তায় খুব ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলেন, জিপটা উল্টে গেল। যাই হোক, বেশি বিপদ হয়নি, কারুর তেমন লাগেনি। কিন্তু গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছেন এখানে। গাড়ি ঠিক না হলে তো আর যেতে পারবেন না !"

"আপনি এত সব কথা জানলেন কী করে ?"

"সেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলা মুশকিল। আমি কী করে যেন সব জেনে যাই।"

"আপনি এমন সব কথা বলছেন, আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি সব সত্যি কথা বলছেন তো ?"

"আমি মিথ্যে কথা একদম বলতেই পারি না !"

"বাবা আমাদের জন্য চিন্তা করছেন, আপনি বাবাকে আমার আর দিদির খবর আর জ্যাঠামশাইয়ের খবর জানিয়ে দিন না !"

"তার যেকোনও উপায় নেই। খবর জানানোর উপায় নেই। তবে আমি একটা কাজ করতে পারি, সেটা তো তোমাকে একটু আগেই বললুম। তোমার সঙ্গে আমার পুকুরপাড়ে যেখানে দেখা হয়েছিল, ঠিক সেইখানে তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি।"

"জ্যাঠামশাইকে বাদ দিয়ে ?"

"উনি যে যেতে চাইছেন না। আমি জোর করতে পারি না!"

"জ্যাঠামশাইকে আপনি নিয়ে এসেছেন কেন আপনার কাছে? আপনি..."

কথা বলতে বলতে দিপু থেমে গেল। তার বাবা তার থেকে মাত্র পাঁচ-ছ'হাত দূরে বসে আছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন দিপুর দিকেই। তা হলে কি বাবা দেখতে পাচ্ছেন তাকে? দিপু আরও এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাবা, আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজে পেয়েছি!"

বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন, "গাড়িটা সারাতে আর কত দেরি?"

দিপু আবার খুব জোরে বলল, "বাবা, আমি এখানে! আমরা ভাল আছি! আমাদের কোনও বিপদ হয়নি!"

বাবা বললেন, "আর একটা গাড়ি ভাড়া করা যায় না? এত দেরি হচ্ছে, আমার একটুও ভাল লাগছে না!"

দিপু হতাশ হয়ে গেল। বাবা সত্যিই শুনতে পাচ্ছেন না তার কথা। দিপু বাবার হাত চেপে ধরল। বাবা অনায়াসেই সেই হাত তুলে মুখ মুছলেন।

দিপু স্বপ্নের মধ্যেই তা হলে বাবাকে দেখছে। স্বপ্ন কখনও হুবহু বাস্তবের মতন হয়?

দিপু পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল ডমরুজি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাহলে দিপু এখন কী করবে, এই স্বপ্নের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবে?

সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে ঘন কুচকুচে অন্ধকার। তার মধ্যে শুধু শোনা যাচ্ছে একটা কোনও পাখির ডাক। সেই পাখির ডাকটা তার মায়ের গলার আওয়াজের মতন। মা যেন ডাকছেন, 'দিপু! দিপু!'

আবার আলো ফুটল আস্তে আস্তে। দিপু দেখল সে শুয়ে আছে আমবাগানে, ঘাসের ওপর। ওপরে আমগাছের ডালে বসে সত্যিই একটা কোকিল 'কুহু কুহু' করে ডাকছে।

দিপু আস্ত-আস্তে উঠে বসল। এবারে কি তার ঘুম ভেঙেছে, না এটাও স্বপ্ন? কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

কাছেই বসে আছেন জ্যাঠামশাই। তিনি মাথা নিচু করে ঝুঁকে গভীরভাবে কী যেন দেখছেন মাটিতে।

দিপু আলতোভাবে ডাকল, "জ্যাঠামশাই!"

জ্যাঠামশাই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, "কীরে দিপু, এখন কেমন লাগছে?"

জ্যাঠামশাই তার কথা শুনতে পেয়েছেন, তা হলে বোধহয় এটা স্বপ্ন নয়। কিংবা, দু'জনে আবার একই স্বপ্নের মধ্যে!

দিপু বলল, "জ্যাঠামশাই, কী যে হচ্ছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না! একটু আগে বাবাকে দেখলুম।"

জ্যাঠামশাই একটুও অবাক না হয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, "তাই নাকি? কেমন আছে খোকন? আমি যে কেন ওদের দেখতে পাই না! তোর মা'কে দেখতে পাসনি?"

"না।"

"তুই আর এখানে থেকে কী করবি, দিপু? তুই ছেলেমানুষ, তোর বেশিদিন ভাল লাগবে না। তা ছাড়া তোর জন্য সবাই চিন্তা করবে।"

"জ্যাঠামশাই, আমি তো আপনাকে খুঁজতেই কলকাতা থেকে এসেছি।"

"আমার খোঁজ তো পেলি। দেখলি আমি কত ভাল আছি। এবারে ফিরে গিয়ে সবাইকে সেই কথা বলিস!"

"কী বলব? সবাই যখন জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোথায় আছেন, কী উত্তর দেব?"

"হ্যাঁ, সেটা খুব শক্ত বটে। লোককে বোঝানো যাবে না। তুই বরং বলিস যে, জ্যাঠামশাই সাধু হয়ে চলে গেছেন। আমি অনেক করে বোঝালুম, তবু তিনি ফিরে এলেন না!"

"জ্যাঠামশাই, আপনি এখানে এলেন কী করে? ওই যে উনি, ডমরুজি, ওঁকে কি আপনি আগে চিনতেন?"

"নাঃ! তবে একবার চেনার পর আর আমি ওঁকে ছাড়তে চাই না। লোকটি অদ্ভুত গুণী, বুঝলি!"

"উনি কি অন্য পৃথিবী থেকে এসেছেন? আমাদের মতন মানুষ নন?"

"না, না, এসব কথা কে বলল তোকে ? উনি আমাদেরই মতন মানুষ। খুব বড় তান্ত্রিক সাধক। কিন্তু উনি মাঝখানে আটকা পড়ে গেছেন।"

"তার মানে ?"

"ওদের সাধনার একটা স্তর আছে, বুঝলি ! একটা বিশেষ সাধনা আছে, যার জোরে এইসব মানুষরা মাটি থেকে শূন্যে উঠে যেতে পারেন, অদৃশ্য হয়ে বিচরণ করতে পারেন, ইচ্ছেমতন স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারেন। বড়-বড় সাধকদের এইরকম ক্ষমতা থাকলেও তা অন্য কারুকে বলেন না। আমাদের এই ডমরুজি ঠিক সাধু নন। আগে ছিলেন ম্যাজিশিয়ান। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে ম্যাজিক দেখাতেন।"

দিপু এবারে খানিকটা উৎসাহিত বোধ করল। ও, ম্যাজিশিয়ান, তা হলে তো খুব ভয় নেই। ম্যাজিশিয়ানরা হিপনোটিজম জানে। লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে যা বলে, লোকে তাই বিশ্বাস করে। কমিক স্ট্রিপের ম্যানড্রেক যেমন দস্যুদের হাতে রাইফেল দেখে বলে ওঠেন, ওটা তো রাইফেল নয়, সাংঘাতিক একটা সাপ, অমনি দস্যুরা সত্যি-সত্যি রাইফেলটাকে সাপ ভেবে ভয় পেয়ে মাটিতে ফেলে দেয় !

দিপু বলল, "আমাদের হিপনোটাইজ করে রেখেছে ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না রে, বোকা। এটা সেরকম ব্যাপার নয়। শোন আগে আসল ব্যাপারটা। ডমরুজি তো ম্যাজিশিয়ান ছিলেন আগে। উনি শুনেছিলেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীরা অদৃশ্য হবার মন্ত্র, আকাশ দিয়ে চলাচল করার উপায় জানে। উনি অনেক সাধুর কাছে ঘুরতে লাগলেন সেই গুপ্তবিদ্যা শেখার জন্য। বেশির ভাগ সাধুই কিন্তু ওই বিদ্যা জানে না। মিথ্যে কথা বলে। ঘুরতে ঘুরতে ডমরুজি একজন সাধুকে পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তিনি অর্ধেকটা জানেন, পুরো জানেন না। ডমরুজি সেটাই শেখার জন্য জোর করতে লাগলেন। এখন ওঁর অবস্থা হয়েছে অভিমন্যুর মতন। তুই অভিমন্যুর কাহিনী জানিস তো ?"

"হ্যাঁ,জানি। চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, আর বেরুতে পারেনি।"

"ঠিক তাই। ডমরুজি আর কিছুতেই বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। তার ফলে অবশ্য আমার খুব লাভ হয়েছে। ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে কি জানতে পারতুম যে, আমাদের চোখে দেখা জগতের পাশাপাশি আর

একটা জগৎ আছে ? আমরা খালি চোখে যত জীবজন্তু বা মানুষ দেখি, তার বাইরেও আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, যাদের অন্য কেউ দেখতে পায় না। নতুন-নতুন রং আছে। গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, ঝগড়া করে। রোদ্দুরের মধ্যেও যেন বৃষ্টি পড়ে।"

"ডমরুজির সঙ্গে আপনার দেখা হল কী করে ?"

"উনি মাঝে-মাঝেই জোর করে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন। উনি একদিন আমার পেয়ারাবাগানে নামবার চেষ্টা করেছিলেন।"

"যে পেয়ারাবাগানটা পুড়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ। লোকে যাকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বলে, উনি তো ঠিক সেই অবস্থায় নেই। উনি আছেন স্বপ্নের জগতে। সেখান থেকে ফেরবার চেষ্টা আগুন জ্বলে ওঠে। এমন কী আকাশের মেঘও দাউদাউ করে থাকে। সে কী অপূর্ব দৃশ্য। ওই তো উনি এসে গেছেন, ওঁকেই সব কথা জিজ্ঞেস কর।"

মুখ ফিরিয়েই দিপু ডমরুজিকে দেখতে পেল। তিনি একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখখানি খুব বিষণ্ণ।

দিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

॥ ২৩ ॥

দারোগাবাবু দু'হাত দিয়ে মাথা চাপা দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "ওরে বাবা রে, এ কী কাণ্ড শুরু হয়ে গেল ! এত ঝড়বৃষ্টি বাপের জন্মে দেখিনি। মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে না তো ! আজ আমি আবার টুপিটাও পরে আসিনি !"

এত কাণ্ডের মধ্যেও ইরানির হাসি পেয়ে গেল। দারোগাবাবুর কি ধারণা মাথায় টুপি পড়লে বাজ আটকানো যায় ?

দেবীদাস ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

খয়েরলাল নদীর ধার থেকে ফিরে আসবার পথে একেবারেই ভিজে গেছে। সে দাঁড়িয়ে আছে কুঁড়েঘরটির দরজার সামনে। তার গায়ে বৃষ্টির জলের ছাঁট লাগছে, তাতে তার গ্রাহ্য নেই।

খয়েরলাল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এক সময় বলল, "সত্যি বড় আশ্চর্য ব্যাপার। খানিকটা দূরে ওই মাঠে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা. গোরু চরছে, ওদের গা একেবারেই শুকনো। ওখানে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই।

সাধুবাবা বললেন, "এই রকমই হয় এখানে। তুমি এখানে নতুন এসেছ তো, তাই জানো না। হঠাৎ-হঠাৎ শুধু একটুখানি জায়গা জুড়ে ঝড়বৃষ্টি নামে।"

খয়েরলাল বলল, "এর নিশ্চয়ই কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ থাকবে। খবরের কাগজের লোকেরা এই আশ্চর্য ব্যাপারটার খবর পায়নি ? এর তো ভালরকম তদন্ত হওয়া দরকার।"

দারোগাবাবু ফোঁস করে বললেন, "তুমি আর তদন্তের কথা তুলো না। হেড কোয়ার্টার থেকে তা হলে আমার ওপরেই দায়িত্ব চাপাবে। পুলিশে কাজ নিয়ে শেষে ঝড়বৃষ্টি কেন হয় তারও তদন্ত করতে হবে নাকি ! এস· পি· সাহেব হয়তো হুকুম করবেন, ঝড়বৃষ্টিকে গ্রেপ্তার করে আনো ! একেই তো একটি ছেলে হারানোর খোঁজে এসে প্রাণ-যায়-যায় অবস্থা !"

খয়েরলাল বলল, "শুধু একটা ছেলে নয়। একজন বুড়ো মানুষও হারিয়েছে। এ-তল্লাট থেকে আরও কেউ-কেউ এ-রকম উধাও হয়ে গেছে কি না তা-ই বা কে জানে ! সবাই তো থানায় খবর দেয় না !"

দারোগাবাবু বললেন, "আমি এ-মাসেই এখান থেকে ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা করব। বাপ রে বাপ ! বৃষ্টি কি থামবে না ?"

আবার খুব জোরে বাজ পড়ার শব্দ হল।

খয়েরলাল সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করল, "ওই মেয়েটির যে ভাই হারিয়ে গেছে, সে-কথা আপনি আগে থেকেই জানতেন, তাই না ! ঠিক করে বলুন তো !"

সাধুবাবা বললেন, "না আগে তা জানতুম না। তবে ওর জ্যাঠামশাই যে এখান থেকে হঠাৎ চলে গেছেন, তা জানা ছিল। মেয়েটিকে দেখেই বুঝলুম।"

"দেখেই বুঝলেন যে, ওর একটি ভাই আছে, আর সেও ওদের জ্যাঠামশাইয়ের মতন হারিয়ে গেছে ?"

"ছেলেটি তার জ্যাঠামশাইয়েরই কাছে গেছে !"

এবারে ইরানি এগিয়ে এসে বলল, "দিপু জ্যাঠামশাইকে খুঁজে পেয়েছে ? কোথায় ? তাহলে সে-কথা সে আমাকে জানাল না ? তা হতেই পারে না !"

সাধুবাবা ইরানির চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর শান্ত ভাবে বললেন, "ভয় নেই, তোমার ভাইয়ের কোনও বিপদ হয়নি !"

"সে কোথায় গেছে আপনি বলতে পারেন ?"

"না। ঠিক বলতে পারি না। একটু-একটু জানি, সবটা জানি না।"

দারোগাবাবু এবারে বেশ রাগেব সঙ্গে বললেন, "ও মশাই ! ও সাধুবাবাজীবন ! খুব যে বড়-বড় কথা বলছেন, এই ঝড়বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন না ? দেখি কী রকম আপনার মন্তরের জোর !"

সাধুবাবা বললেন, "আমার মন্তরের জোর আছে, আমি তো সে-কথা বলিনি !"

"এই যে চোরটার গায়ে কী মন্ত্র পড়ে জল ছেটালেন আর ওর গায়ের ব্যথা সেরে গেল !"

"ওর ব্যথা এমনিতেই সারত, আমি জল ছেটালুম বলে একটু তাড়াতাড়ি সারল। এই ঝড়বৃষ্টিও খানিক পরেই আপনা-আপনি থেমে যাবে। আর একটু ধৈর্য ধরুন !"

"কী করে জানলেন আর একটু পরেই থামবে ?"

"অসময়ের ঝড়বৃষ্টি তো বেশিক্ষণ থাকে না !"

খয়েরলাল হঠাৎ ঢিপ করে সাধুবাবার পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলল, "আপনি সত্যিই একজন মহাপুরুষ !"

সাধুবাবা একটু হেসে বললেন, "হঠাৎ তোমার এরকম ভক্তি হল যে ! আমি তো মহাপুরুষ নই। আমি সাধারণ একজন সন্ন্যাসী !"

খয়েরলাল বলল, "আমি আগে যত সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি, তারা প্রায় সবাই ভণ্ড সাধু, যে যত ভণ্ড সাধু সে তত বড়-বড় কথা বলে ! আপনি গেরুয়া কাপড় পরেও খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলছেন বলেই আপনাকে

মহাপুরুষ হিসেবে মানছি !”

সাধুবাবা বললেন, “বড়-বড় কথা আমি জানিই না, তা বলব কী করে ? বেশি লেখাপড়াও তো শিখিনি !”

খয়েরলাল বলল, “তবু আপনাকে অনুরোধ করছি, একটা কথার উত্তর দিন। আপনার কি কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে ?”

সাধুবাবা একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “নাঃ, সে-রকম কিছু নেই। তবে অন্য লোক যা দেখতে পায় না, সে-রকম কিছু-কিছু জিনিস আমি দেখতে পাই।”

“আপনি অনেক দূরের কোনও জিনিস বা ঘটনা দেখতে পান ? কুড়ি মাইল, পঞ্চাশ মাইল দূরের...”

“কখনও কখনও পাই। সব সময় পাই না।”

“আপনি মানুষের মুখ দেখে তার পরিচয় বুঝতে পারেন ?”

“তাও কখনও-কখনও বুঝি, সব সময় বুঝি না।”

“আমার মুখ দেখে কিছু বুঝেছেন ? আমি কী রকম মানুষ বলতে পারেন ?”

“তুমি...তুমি আগে ট্রেনে ডাকাতি করতে, তাই না ? একবার ধরা পড়ে গিয়েছিলে। ঠিক বলছি ? পুলিশের একজন বড়কর্তার তোমাকে দেখে দয়া হয়। তিনি তোমার শাস্তি কমিয়ে দিয়ে পুলিশে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। তুমি এখন ডাকাত-ধরার কাজ করো। ট্রেনে-ট্রেনে ঘুরে বেড়াও। মিলেছে কি ? কি জানি, নাও মিলতে পারে।”

“প্রত্যেকটা কথা মিলেছে। আমি এদিকে এসেছিলাম একটা ছিঁচকে ডাকাতদলের খোঁজে। তারা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা আপনাকে বলতে হবে !”

“অত আমি পারব না বাপু ! যাদের দেখিনি, তারা কোথায় আছে কী করে বলব ?”

“এই মেয়েটির যে ভাই হারিয়ে গেছে, সেটা ওর মুখ দেখেই আপনি বুঝতে পেরেছেন। ওর ভাই কোথায় আছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?”

“না। দেখতে পাচ্ছি না। তবে আন্দাজ করতে পারি !”

সাধুবাবা ইরানির দিকে ফিরে বললেন, "তোমার ভাইকে ফিরিয়ে আনার দু' একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমে একটা কাজ করা যাক। তুমি খুব মন দিয়ে, অন্য কোনও কিছু চিন্তা না করে, শুধু তোমার ভাইয়ের মুখটা মনে রেখে, ওর নাম ধরে ডাকতে পারবে ?"

ইরানি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। পারব।"

"তুমি ওই বৃষ্টির মধ্যে চলে যাও, মা। তারপর ডাকো তো তোমার ভাইকে।"

ইরানি সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। তারপর বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে, চোখ বুজে প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'দিপু ! দিপু !"

॥ ২৪ ॥

কুঁড়েঘরের দরজার কাছে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে ইরানিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে ইরানি, হাজার হাজার তীরের মতন বৃষ্টির ঝাঁক যেন বিঁধে যাচ্ছে তার গায়ে। এত জোর বৃষ্টি সাধারণত দেখা যায় না। শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। সেই শব্দ ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে ইরানির তীক্ষ্ণ গলার ডাক, দিপু, দিপু, দিপু !

দারোগাবাবুর এই দৃশ্য সহ্য হল না। বিরক্তিতে তাঁর মুখখানা একখানা ভিমরুলের চাক হয়ে গেল।

একটু পরেই তিনি বলে উঠলেন, "এসব কী পাগলের কাণ্ড হচ্ছে ? অ্যাঁ ? মেয়েটাকে এই বৃষ্টিতে ভেজাচ্ছেন, ওর নিউমোনিয়া হয়ে যাবে যে !"

সাধুবাবা বললেন, "ভয় নেই, সে রকম কিছু হবে না।"

দারোগাবাবু বললেন, "দেখুন মশাই, আপনি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, আপনার মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস হয় না। মন্তর-টন্তর দিয়ে কী করে দেবেন তার ঠিক নেই তো ! তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মেয়েটার যদি কিছু কঠিন অসুখ হয়, তার জন্য আপনি দায়ী হবেন ?"

সাধুবাবা বললেন, "অল্প বয়েস, বৃষ্টি ভিজলে কী আর এমন ক্ষতি হবে ? বাচ্চারা তো ইচ্ছে করে প্রায়ই এমন ভেজে। তা আপনি যদি চান,

তাহলে মেয়েটিকে ডেকে ফিরিয়ে আনুন !"

খয়েরলালের কথাবার্তায় যে একটা ওপরচালাকির ভাব ছিল, এখন আর সেটা নেই। সে যে নিজেই আগে ট্রেনে ডাকাতি করত, এটা সাধুবাবা তার মুখ দেখে বলে দিয়েছেন। এ জন্য তার খুব ভক্তি হয়েছে সাধুবাবার ওপর।

সে এবারে বলল, "না, না,সাধুবাবা যা বলছেন তাই-ই করতে দিন। উনি গুণী লোক !"

পরের মুহূর্তেই ঠিক ম্যাজিকের মতন একসঙ্গে তিনটে কাণ্ড হল।

প্রচণ্ড জোরে বাজ ডাকার শব্দ হল, বৃষ্টি থেমে গেল হঠাৎ, আর ইরানি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

দারোগা বাজের শব্দে দু' হাতে মাথা চাপা দিলেন এবং ইরানির লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠল। মাথা থেকে হাত নামিয়ে তিনি সাধুবাবার কাঁধ চেপে ধরে বললেন, "মেরে ফেললেন, আপনি মেয়েটাকে মেরে ফেললেন !"

খয়েরলাল ছুটে চলে গেল ইরানির দিকে।

সাধুবাবা বলতে লাগলেন, "ছাড়ুন, আমাকে ছাড়ুন, মেয়েটিকে আগে গিয়ে দেখি !"

দারোগাবাবু বজ্রমুঠিতে তাঁকে ধরে রেখে বললেন, "না, ছাড়ব না। আপনি সাধু হোন আর যা-ই হোন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট !"

খয়েরলাল চেঁচিয়ে বলল, "এদিকে একবার আসুন তো। ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সাধুবাবা দারোগাবাবুর দিকে মুখ করে কঠিনভাবে বললেন, "ছেলেমানুষি করবেন না, ছাড়ুন আমাকে। মেয়েটির যদি সত্যি কিছু হয়, তবে তার ফল ভোগ করতে হবে আপনাকেই !"

দারোগাবাবু এতেও সাধুবাবাকে একেবারে ছাড়লেন না, তাঁর একটা হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এলেন ইরানির কাছে।

খয়েরলাল বলল, "মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে !"

দারোগাবাবু বললেন, "মাথায় বাজ পড়েছে ! কী আওয়াজ, যেন একসঙ্গে দশখানা কামান। এই বাজ পড়লে কেউ বাঁচে ? দেখছ না

মুখখানা নীল হয়ে গেছে !"

সাধুবাবা নিচু হয়ে ইরানির কপালে হাত ছোঁয়ালেন। ইরানির চোখ দুটি বোজা। উনি আঙুল বুলিয়ে দিলেন চোখের পাতায়। তারপর বললেন, "ভয় নেই, কিছু ভয় নেই !"

দারোগাবাবু বললেন, "দেখুন তো, নিশ্বাস পড়ছে কি না !"

সাধুবাবা বললেন, "বললুম তো ভয় নেই। মেঘের গর্জন হলেই মাটিতে বাজ পড়ে না।"

দারোগাবাবু বললেন, "জল নিয়ে এসো ! ওর মাথায় জল ছেটাও !"

সাধুবাবা বললেন, "আশ্চর্য ! এতক্ষণ যে বৃষ্টিতে ভিজেছে, তার মাথায় আবার জল দিতে হবে কেন ? কিচ্ছু দরকার নেই।"

তিনি ইরানিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলে এলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, "থাক, ও এমনি থাক।"

দারোগাবাবু বললেন, "ওর বাপ-মায়ের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই ? কলকাতা থেকে এত দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে বড় কেউ আসেনি ! ছেলেটা গেল নিরুদ্দেশ হয়ে আর মেয়েটা শ্মশানঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। এখন ওদের বাপ-মায়ের কাছে কী করে খবর পাঠাই ? কোথায় বাড়ি, তাও তো জানি না !"

খয়েবলাল বলল, "মেয়েটার সত্যিই খুব সাহস ! ট্রেনে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তো ! সেই ট্রেনের কামরাতেই একদল চ্যাংড়া ডাকাত উঠেছিল, তাদের সঙ্গে রিভলবার পর্যন্ত ছিল। আমি তো দেখছি, ডাকাতের সামনে পড়লে কত হোমরাচোমরা লোকও ভয়ের চোটে কেঁদে ফেলে। কিন্তু এই মেয়েটা ভয় পায়নি। ডাকাতদের মুখে মুখে কথা বলেছে। বলতে পারেন, অনেকটা ওর জন্যই আমি ডাকাত-দলটাকে ঘায়েল করতে পেরেছি !"

সাধুবাবা বললেন, "মেয়েটির মনের জোর খুব সাংঘাতিক। ওই যে আমি বললুম, আর কোনও কিছু না ভেবে শুধু তোমার ভাইয়ের মুখটা চিন্তা করো, সেটা করা খুব শক্ত। সবাই পারে না। কোনও একটা জিনিস চিন্তা করতে গেলেই অন্য আরও পাঁচ রকম কথা মনে আসে।"

খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "আপনি ধ্যান করার কথা বলছেন ?"

সাধুবাবা বললেন, "হ্যাঁ, তা বলতে পারো। কেউ ভগবানের নামে ধ্যান করে, কেউ কোনও মানুষের জন্য ধ্যান করে। সত্যিকারের একমনে কারুর কথা চিন্তা করতে পারলে অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে হয়। এই মেয়েটিরও তাই হয়েছে।"

দারোগাবাবু বললেন, "এখন তো ওর চিকিৎসা করার দরকার।"

সাধুবাবা বললেন, "কিচ্ছু দরকার নেই।"

"আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ, নিচ্ছি। চলুন, আমরা বাইরে যাই, এখানে বেশি কথাবার্তা বললে ওর অসুবিধে হবে।"

বৃষ্টি থামতেই দেবীদাস তার বউ আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সরে পড়েছে। রোদ উঠে গেছে, আকাশে ভাসছে সাদা-সাদা পাতলা মেঘ। একটু আগে যে এখানে সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই, শুধু মাটি ভিজে আছে।

খয়েরলাল বলল, "সাধুবাবা, একটা কথা বুঝিয়ে দেবেন ? আপনি বৃষ্টির মধ্যে ওই মেয়েটিকে পাঠালেন ওর ভাইয়ের নাম ধরে ডাকবার জন্য। ওর ভাই কি এ ডাক শুনতে পাবে ? সে কি কাছাকাছি আছে ?"

দারোগাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এটা জানতে চাই। আমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে। যা ঘটল, সব যদি লিখি, তা হলে যে-কেউ ভাববে আমি গাঁজাখুরি গপ্পো বানিয়েছি।"

বৃষ্টিতে সাধুবাবার ধুনি নিভে গেছে। ঘর থেকে তিনি কয়েকখানা শুকনো কাঠ এনে আবার আগুন জ্বালতে লাগলেন। আগুন জ্বলে ওঠার পর তিনি বললেন, "আমি যা বলব, তা হয়তো আপনাদের বিশ্বাস হবে না। আপনাদের বিশ্বাস এক রকম, আর আমার বিশ্বাস অন্য রকম। আমি যা ভাল বুঝেছি, তা-ই ওকে করতে বলেছি।"

দারোগাবাবু বললেন, "তা বলে একটা কিছু কারণ তো থাকবে! চতুর্দিকে খুঁজে দেখা হয়েছে, ওর ভাইকে পাওয়া যায়নি। আর এখানে বসে বসে চেঁচিয়ে ডাকলেই তার সন্ধান পাওয়া যাবে ? আমার মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছেন কেন সাধুবাবাজি ? পরিষ্কার করে বলুন, খোলসা করে বলুন!"

"চেঁচিয়ে ডাকাটা আসল ছিল না। আসল ছিল খুব একমনে ওর ভাইয়ের কথা চিন্তা করা।"

"তাতেই বা কী হয়?"

"তাতে অনেক সময় দূরের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। সবাই পারে না, কেউ-কেউ পারে। তাই দেখছিলাম, এই মেয়েটি পারে কি না!"

"ঘরে বসে বুঝি চিন্তা করা যায় না? তার জন্য বৃষ্টিতে ভিজতে হবে? বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় করে বসে থাকতে হবে?"

"এটাও তো একটা পরীক্ষা! ও যদি ভাইকে সত্যি ভালবাসে, তা হলে বজ্র-বিদ্যুতে ভয় পাবে কেন? বৃষ্টি ভিজতেও অরাজি হবে না। অন্য কোনও কথাই তো আর ওর মনে আসবে না। তা ছাড়া, আর-একটাও কারণ ছিল। ওকে পাঠালুম বলেই বৃষ্টি এত তাড়াতাড়ি থেমে গেল।"

"অ্যাঁ? ওর জন্য?"

"বজ্র-বিদ্যুতেরও তো দয়া-মায়া আছে। ওইটুকু মেয়েকে তারা কষ্ট দেবে কেন?"

"আবার মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছেন? বজ্র-বিদ্যুৎ কি মানুষ যে, তাদের দয়া-মায়া থাকবে?"

"মানুষ ছাড়া আর কারুর বুঝি দয়া-মায়া নেই? পশুর নেই? গাছের নেই? তেমনি আলো, হাওয়া, রোদ, অন্ধকার, বৃষ্টি—এদেরও আছে। যাই হোক, ওই মেয়েটি যদি বজ্রের আওয়াজ শুনে ভয়ে পালিয়ে আসত, তা হলে আমি আর-একটা পরীক্ষা করতুম।"

"কী?"

"আগুন জ্বেলে তার ওপর ওর একটা হাত রাখতে বলতুম। তারপর বলতুম, ওর ভাইয়ের কথা চিন্তা করতে।"

"সেটা আমি মোটেই অ্যালাও করতুম না! আমার চোখের সামনে ওইসব ডেঞ্জারাস কাজ, অসম্ভব! বৃষ্টি তবু এক কথা, তা বলে আগুনে হাত পোড়ানো!"

খয়েরলাল ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বলল, "এবারে অনেকটা বুঝতে পারছি।"

দারোগাবাবু তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি কিছুই বোঝোনি।

চুপ করে থাকো ! যে-জন্য এখানে আসা, তার তো কিছুই সুরাহা হল না। দিপু গেল কোথায় ? তার জ্যাঠাই বা গেল কোথায় ?"

সাধুবাবা বললেন, "ওই মেয়েটির জ্ঞান ফিরুক। হয়তো ওর কাছ থেকেই জানতে পারবেন।"

॥ ২৫ ॥

দিপু আবার ফিরে এসেছে আমবাগানে। তার খিদে পাচ্ছে একটু একটু। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, স্বপ্নের মধ্যে থাকলে খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না। তাহলে এখন কি সে স্বপ্নের মধ্যে আছে, না জেগে উঠেছে ? জ্যাঠামশাইকে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ডমরুজিও কাছাকাছি নেই। ওঁরা গেলেন কোথায় ?

এই আমবাগানটা কোন্ জায়গায় তা দিপু জানে না। বাগানটি বেশ বড়। অধিকাংশ জায়গাই ঝোপঝাড়ে ভরা, মাঝে-মাঝে একটু-একটু ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গায় বেশ সুন্দর নরম ঘাস, ঠিক সবুজ কার্পেটের মতন বিছানো। অবশ্য খানিকটা দূরেই দেখা যাচ্ছে মাঠে গোরু চরছে। দুটো রাখাল-ছেলেও রয়েছে। এক ছুটে ওখানে চলে যাওয়া যায় না ? ওদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই নিশ্চয়ই জানা যাবে ঘোরাডাঙা কত দূরে।

কিন্তু জ্যাঠামশাইকে না নিয়ে সে ফিরবে কী করে ? তাহলে তো এতদূরে আসার কোনও মানেই হয় না। সেই একটা অচেনা জায়গায় একটা মোটর গ্যারাজের সামনে বাবাকে দেখতে পাওয়ার পর থেকেই দিপুর মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর এসেছেন বাবা। জ্যাঠামশাইয়ের বাগানে এসে পৌঁছলেও তো কিছুই খবর পাবেন না।

ডমরুজি গেলেন কোথায় ? তাঁকে কী করে ডাকতে হয় দিপু জানে না। যখন-তখন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তবে, তিনি বলেছেন, তিনি এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

ডমরুজির ব্যাপারটা যে ঠিক কী, তা দিপু এখনও বুঝতে পারছে না। উনি স্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়ে আর বেরুতে পারছেন না। তবে কি উনি

শূন্যে ঝুলছেন ? মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তার শরীরটা তো
জায়গায় শুয়ে থাকে। শরীরটাও হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে নাকি ?

দিপু উঠে বসে একটা গাছের গুঁড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেখানে কেমন যেন আলোছায়ার খেলা চলছে। কী যেন একটা ছবি সরে সরে যাচ্ছে।

দিপু অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী ? এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল মুখ ঘুরিয়ে। না, কেউ তো সেখানে আলো ফেলছে না। হঠাৎ যেন জায়গাটা কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েই আবার আগের মতন আলো ঝলমলিয়ে উঠল। তারপর দিপু দেখল সেখানে দুটি বাচ্চা ছেলে খলখল করে হাসছে !

ছেলে দুটির বয়েস আট-ন' বছর, ছোট্ট ছোট্ট ধুতি পরা, আর খালি পা। ওদের দু'জনেরই একমাথা চুল আর মুখ বেশ সুন্দর। ছেলে দুটো একটা আখ খাচ্ছে। একটাই আখ, একবার একজন কামড় দিচ্ছে, আর-একবার অন্য একজন। দারুণ যেন একটা মজার ব্যাপার, এইভাবে মাঝে-মাঝে ওরা হেসে উঠছে খিলখিল করে।

দিপুকে ওরা দেখতেই পাচ্ছে না।

দিপু চোখ রগড়াল। এটাও কি স্বপ্ন নাকি ? কিন্তু ছেলে দুটো তো একেবারে তার সামনেই। সে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে।

দিপু হাত বাড়াতেই ছেলে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর গাছের ওপর থেকে কে যেন ডেকে উঠল, "দিপু ! দিপু !"

দিপুর সারা গায়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল। এসব কী হচ্ছে রে বাবা ! ছেলে দুটো মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে ? এই তো এইমাত্র জলজ্যান্ত ভাবে হাসছিল।

দিপু গাছের ওপর দিকে তাকাল। কে ডাকছে তাকে ?

ওপরে কিছুই দেখতে পেল না সে। একটা কী পাখি যেন পিক-পিক করছে। অথচ দিপু স্পষ্ট নিজের নাম শুনতে পেয়েছে।

দিপু উঠে এবার সামনের মাঠটার দিকে যেতে চাইল। ওখানে রাখাল দু'জন এখনও রয়েছে। একজন রাখাল কী যেন একটা গান ধরেছে, তাও শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে।

আবার কেউ ডাকল, "দিপু ! দিপু !"
দিপু এবার উত্তর দিল, "কে ? কে ?"

আবার সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল কয়েক পলকের জন্য। কেউ যেন একটা কালো পর্দা টেনে দিচ্ছে তার চোখের সামনের দিকে। দিপু দেখতে পেল বাতাস যেন ময়ূরের পালকের মতন চিত্র-বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তার গায়ে যে বাতাস এসে লাগছে, তা যেন একটা সূক্ষ্ম মাকড়সার জালে বোনা শাল।

সেই রঙিন বাতাস গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে মাঠের দিকে।

"ভয় পেয়ে গেলে নাকি, দিপুবাবু ?"

চমকে পাশ ফিরে তাকাতেই দিপু দেখতে পেল ডমরুজিকে। তিনি কখন আবার ফিরে এসেছেন।

দিপু তাঁর হাত চেপে ধরে বলল; "এই মাত্র কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম ? ঠিক করে বলুন তো !"

ডমরুজি হেসে বললেন, "না, স্বপ্ন দ্যাখোনি।"

"তা হলে এই মাত্র যে দুটি বাচ্চা ছেলেকে দেখলুম, তারা কোথায় গেল ?"

"তা তো জানি না !"

"আমার চোখের সামনে ওরা হাসছিল আর একটা আখ খাচ্ছিল, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে ? তবে কি ওরা..."

"তোমার ভূতের ভয় আছে নাকি ?"

"না ! ভূত আবার কী ? কিন্তু ওরা মিলিয়ে গেল বাতাসে।"

"তুমি বোধহয় অনেকদিন আগের কোনও দৃশ্য দেখেছ !"

"তার মানে ?"

"পৃথিবী থেকে সব কিছু হারিয়ে যায় না। অনেক সুন্দর দৃশ্য থেকে যায়। দুটি ছেলে একটা আখ খেতে খেতে হাসছে, এটা একটা সুন্দর দৃশ্য না ? এই সব দৃশ্য মাঝে-মাঝে ফিরে আসে। যারা ভাগ্যবান, শুধু তারাই দেখতে পায়।"

"এখানকার বাতাসও কী রকম রঙিন হয়ে গেছে।"

"যখন সুন্দর কিছু ঘটে, তখন হাওয়াও বদলে যায়। একে বলে

সুপবন !"

দিপু আর কিছু বলার আগেই আবার কে যেন 'দিপু, দিপু' বলে ডেকে উঠল। গলার আওয়াজটা খুব চেনা।

"আমায় কে ডাকছে ! আমায় কে ডাকছে !"

"হ্যাঁ, তোমাকে একজন ডাকছে ঠিকই ! সেইজন্যই তো আমি তাড়াতাড়ি তোমার দিকে ছুটে এলুম।"

"কে ডাকছে ?"

"শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে !"

"আপনি কী বলছেন ? কেন মন খারাপ হবে ?"

"ঠিক আছে, চলো, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।"

ডমরুজি কাছে এসে দিপুর চোখে হাত বোলাতেই দিপু ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার দেখতে পেল অনেক কিছু। স্বপ্নের মতন দেখা নয়, অবিকল বাস্তবের মতন।

দিপু দেখল নদীর ধারে একটা শ্মশানমতন জায়গা। সেখানে খুব বৃষ্টি পড়ছিল বোধহয় এই মাত্র, মাটি দিয়ে জল গড়াচ্ছে, বাতাসে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

কাছেই একটা কুঁড়েঘর। তার সামনের খোলা জায়গাটায় একটা মেয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে একজন গেরুয়া-পরা সাধু, আর অন্য দু'জন লোক। এর মধ্যে একটি লোক দিপুর চেনা। হাওড়া থেকে ট্রেনে আসবার সময় এই লোকটাই ডাকাতদের কাছ থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল।

সাধুবাবাটি অজ্ঞান মেয়েটিকে মাটি থেকে কোলে তুলে নিতেই তার মুখ দেখতে পেয়ে দিপু আর্তস্বরে বলে উঠল, "দিদি !"

ডমরুজি বললেন, "হ্যাঁ, তোমার দিদি এতক্ষণ তোমায় ডাকছিল। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভয় নেই, ওর কোনও ক্ষতি হবে না।"

দিপু বলল, "দিদি আমায় ডাকছিল ? আমি তা শুনতে পেলাম কী করে ?"

"তোমার দিদির সাংঘাতিক মনের জোর। মনটাকে এমন একাগ্র করে

তুলেছিল যে, ঠিক খুঁজে পেত তোমাকে। কিন্তু তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এ খুব সাংঘাতিক শক্ত ব্যাপার!"

"আমার দিদি এখানে এল কী করে? ওই সাধুটি কে?"

"ঐ সাধুটি হচ্ছেন আমার গুরুভাই। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমি আবার ফেরার পথ খুঁজে পেতে পারতুম। কিন্তু কিছুতেই যে কথা বলতে পারছি না।"

"এই তো এত কাছে, কথা বলুন না!"

"আমরা তো স্বপ্নের জগতে রয়েছি না? আমাদের কথা ওরা শুনতে পারে না। আমি আমার স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে বাইরে শরীর ধরে আসার চেষ্টা করলেই যে সাংঘাতিক একটা উত্তাপ হয়। মেঘ গলে যায়। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি নামে।"

"এসব কী বলছেন আপনি?"

"দাঁড়াও, এসব কথা পরে হবে। আমি হঠাৎ আর একটা জিনিস টের পাচ্ছি। তোমার দিদি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে আর স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মধ্যে সে তোমাকে খুঁজছে। আমার গুরুভাই ওই যে সাধুটি, উনি তোমার দিদিকে মায়ানিদ্রা দিয়েছেন। এসো, এখন আমরা তোমার দিদির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ি।"

"কী করে ঢুকব?"

"তুমি চোখ বুজে শুধু তোমার দিদির কথা ভাবো। আর কিছু ভাববে না কিন্তু। দিদির মুখখানা ভাবো, আর তার নাম ধরে ডাকো। ঘুমোও, ঘুমোও, আর কেউ নেই, শুধু তোমার দিদি, শুধু ইরানি, শুধু ইরানি..."

দিপু আচ্ছন্নের মতন বলে উঠল, "দিদি, আমি এখানে!"

॥ ২৬ ॥

জিপগাড়িটা সারাতে সারাতে সকাল দশটা বেজে গেল। রীতিমতন চড়া রোদ। বাবা খুব মন-মরা হয়ে গেছেন। রমেন সরকার অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন সামনের রাস্তায়। তাঁর মেজাজ বেশ গরম। তাঁর ধারণা এই ছোট্ট জায়গার মেকানিকরা কিছুই কাজ জানে না, এরা আরও খারাপ

করে দিচ্ছে গাড়িটা। এর মধ্যে নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে অকারণে বকুনি দিয়েছেন কয়েকবার।

পরিতোষ ডাক্তার অন্য একটা গাড়ির খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। এই জায়গায় তাঁর চেনা একজন পেশেন্ট আছে। কিন্তু এত ছোট জায়গা, এখানে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।

যাই হোক, জিপগাড়িটা শেষ পর্যন্ত চালু হল। রমেন সরকারকে একটা জরুরি তদন্তে বর্ধমানে যেতে হবে। তিনি মেমারিতে এসে বর্ধমানে ফোন করলেন। সেখানকার সব খবর-টবর নিয়ে জানলেন যে, বর্ধমানের এস· পি· অনেকখানি কাজ এগিয়ে রেখেছেন। তাঁর এক্ষুনি যাবার দরকার নেই।

রমেন সরকার বাবাকে বললেন, "চলুন অরুণবাবু, আগে আপনাদের সঙ্গে ঘোড়াডাঙা ঘুরে আসি। আপনাদের আমি দেরি করিয়ে দিলাম, সেজন্য লজ্জিত।"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "দেরি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন ভালয়-ভালয় সবাইকে ফিরে পেলেই হয়।"

বাকি রাস্তাটা সবাই চুপচাপ রইলেন। বাবা ঘন ঘন হাঁটু দোলাচ্ছেন। পরিতোষ ডাক্তার শুধু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাল রাত্তিরে এখানে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে শুনেছিলুম। কই, কোনো চিহ্ন তো দেখছি না। আকাশ পরিষ্কার।"

প্রথমে আসা হল থানায়। সেখানে বড়বাবু নেই। একজন কনস্টেবল সব ঘটনা জানাল। ইরানি এসেছিল তার ভাই হারিয়ে যাবার খবর দিতে। তারপর দারোগাবাবু তাকে নিয়ে তদন্তে গেছেন।

দিপুও হারিয়ে গেছে শুনে বাবার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমার দাদা···দিপু···এসব কী ব্যাপার ? আমার ছেলেটা বড় খেয়ালি, কখন যে কী করে ঠিক নেই, ওকে কেউ অনায়াসেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে···"

রমেন সরকার বললেন, "আগে থেকেই ব্যস্ত হবেন না। চলুন, আপনার দাদার বাগানে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী। একজন বুড়োমানুষ আর একটা বাচ্চা ছেলে একই জায়গা থেকে হারিয়ে গেল, এটা খুবই

অস্বাভাবিক !”

জিপটা এসে থামল জ্যাঠামশাইয়ের বাগানের পুকুরধারে। গাড়ির আওয়াজ শুনেই মধু দৌড়ে এসেছে। বাবাকে সে চেনে। তাকে প্রণাম করেই মধু কাঁচুমাচু ভাবে বলল, “খোকাবাবু এখনও ফেরেনি ! আমি চারধারের সব ক'খানা গাঁয়ে লোক পাঠিয়েছিলুম, কেউ কোনও খবর দিতে পারল না !”

বাবা বললেন, “কী হয়েছিল ? দিপু কখন হারিয়ে গেল ?”

মধু বলল, “সেটাই তো কেউ জানে না ! রাত্রে ভাই-বোনে ঘুমোতে গেল। আমি তারপরেও জেগে ছিলুম খানিকক্ষণ। সকালে উঠে দেখা গেল খোকাবাবু নেই। নিশ্চয়ই নিজেই ঘর থেকে বেরিয়েছে ভোরবেলা !”

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, “নিজে নিজে বেরিয়ে একেবারে উধাও হয়ে গেল ? বাইরে থেকে কেউ এসেছিল ?”

মধু বলল, “না, বাবু ! কেউ আসেনি। রাত্তিরে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে কুকুর-বেড়ালও বেরোয় না।”

রমেন সরকার ওদের কথা শুনছেন বটে, আবার তিনি ঘুরে ঘুরে পুকুর আর পুড়ে যাওয়া পেয়ারাবাগানটাও দেখলেন। তারপর তিনি মধুর কাছে এসে বললেন, “পুকুরটা একেবারে শুকিয়ে গেল কী করে ? পেয়ারাবাগানেই বা আগুন লাগাল কে ?”

মধু বলল, “আগুন লাগেনি স্যার ! একটা সাংঘাতিক বাজ পড়েছিল, সে কী আওয়াজ ! তাতেই পুকুরের এই দশা হল, আর পেয়ারাবাগানটা...”

রমেন সরকার বললেন, “বাজ পড়ে পুকুর শুকিয়ে যায় ?”

মধু বলল, “আমিও তো এমন কথা শুনিনি। সেই সময় নাকি মেঘে আগুন লেগে গিয়েছিল, কাছাকাছি গ্রাম থেকে কেউ কেউ দেখেছে। সেই আগুনে পুকুরের জল ধোঁয়া হয়ে গেল।”

রমেন সরকার পরিতোষ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, “রূপকথার গল্প মনে হচ্ছে না ?”

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, “যাই বলুন, মনে হচ্ছে এখানে অলৌকিক কিছু ব্যাপার আছে। এখানে পৌঁছেই যেন কেমন কেমন লাগছে।”

বাবা জিপের পা-দানিতে বসে পড়ে বললেন, "মধু,আমার ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে পাঠালুম, তুমি তাদের চোখে-চোখে রাখতে পারলে না ? আমার দাদারই বা কী হয়েছে ?"

মধু বলল, "আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন, হাঁটুতে কষ্ট হচ্ছিল। সেই মানুষ রাত্তিরবেলা কোথাও যেতে পারেন ? বাইরে থেকে কেউ আসেনি, উনি সাইকেলেও যাননি, সাইকেলটা আগেই চুরি হয়ে গেছে ! জলজ্যান্ত মানুষটা কি অদৃশ্য হয়ে গেল !"

বাবা তাকালেন রমেন সরকারের মুখের দিকে। তিনি কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। তবু তিনি জোর করে হেসে বললেন, "একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। অলৌকিক বলে তো মেনে নেওয়া যায় না ! ইরানি কোথায়, থানার দারোগাই বা কোথায় ? শুনলাম যে তারা এদিকে এসেছে ?"

মধু বলল, "তেনারা তো শ্মশানে সাধুবাবার কাছে গেছেন !"

রমেন সরকার ভুরু তুলে বললেন, "শ্মশানে ? সাধুবাবার কাছে ? কেন ?"

মধু বলল, "কারুর কোনও জিনিস হারিয়ে গেলে সাধুবাবা বলে দিতে পারেন। সেই জন্যই গেছেন !"

রমেন সরকার ধমক দিয়ে বললেন, "ননসেন্স ! পুলিশ বিভাগের কি এই দুরবস্থা হল ? নিজেরা কোনও রহস্যের কিনারা করতে পারবে না, সাধু-সন্ন্যাসীর সাহায্য নেবে ! চলুন তো, দেখি সেই সাধুবাবাকে ! উঠুন, গাড়িতে উঠুন !"

মধু বলল, "শ্মশানের ধারে গাড়ি যাবে না। হেঁটে যেতে হবে।"

"চলুন, হেঁটেই যাব। কত দূর ?"

"বেশি দূর নয়, স্যার, দশ মিনিটের হাঁটা-রাস্তা !"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান ! আমরা যেতে পারি, অরুণ তো হাঁটতে পারবে না অতটা ! অরুণ তাহলে এখানেই থাকুক !"

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমি ঠিক হাঁটতে পারব। এখানে একা একা বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব !"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "অরুণ, তোমার পা এখনও ভাল করে সারেনি, তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

বাবা তবু জোর দিয়ে বললেন, "আমাকে বারণ করে লাভ নেই। আমি যাবই।"

রমেন সরকার বললেন, "শুনুন, ডাক্তারবাবু। মনের জোরটাই আসল কথা। উনি যদি মনে করেন হাঁটাতে পারবেন, তাহলে ওঁকে বাধা দিচ্ছেন কেন?"

লেবুবাগানের পাশ দিয়ে ওঁরা হাঁটতে শুরু করতেই গরগর করে আকাশে মেঘ ডাকল। সবদিক কালো হয়ে এল। তারপরেই বৃষ্টি নামল।

এত জোর বৃষ্টি যে, এর মধ্যে হাঁটার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সবাই প্রায় দৌড়ে চলে এলেন ঘরের মধ্যে। সবাই দারুণ অবাক।

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "ব্যাপারটা কী হল বলুন তো? রোদ ঝকঝক করছিল, আকাশে একটু মেঘ দেখিনি, হঠাৎ এরকম বৃষ্টি?"

বাবা বললেন, "এত জোর বাজ ডাকার শব্দও তো শুনিনি।"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "অলৌকিক কিছু না হোক, এখানে একটা কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে নিশ্চয়ই।"

রমেন সরকার চিন্তিত মুখে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মধুকে ডেকে বললেন, "দু'-একটা কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নিই। অরুণবাবুর দাদা, আপনার বড়বাবু, তিনি তো এখানেই থাকতেন বেশির ভাগ সময়, তাই না? তিনি বেশি কলকাতাতে যাওয়াও পছন্দ করতেন না। তাহলে বাইরের কাজকর্ম কে করত?"

মধু বলল, "দরকার হলে তিনি আমাকেই পাঠাতেন। এই তো আমি ঝাড়গ্রামে গেসলুম, ফরেস্ট অফিস থেকে ভাল-ভাল গাছের চারা আনতে!"

"বাইরের কোনও লোক ওঁর সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসত?"

"আজ্ঞে না, স্যার। এই গ্রামের লোকজন কিছু আসত, থানার দারোগা আসতেন, সে সবাই চেনা। অচেনা কেউ আসতেন না! আমি তো কখনও দেখিনি। তবে..."

"তবে কী?"

"উনি মাঝে-মাঝে আপন মনে কথা বলতেন। বিড়বিড় করে নয়, জোরে জোরে। পাশ থেকে কেউ শুনলে ভাবত, উনি বুঝি অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলছেন! আমাদের এককড়ি বলত, বড়বাবু গাছের সঙ্গে কথা বলেন।"

"এককড়ি কে?"

"আমাদের এখানে রান্না করত। আজ সকালে সে চলে গেছে।"

"আর একজন নিখোঁজ?"

"না, স্যার। সে নিজে-নিজেই চলে গেছে। সে একটু পাগলমতন তো!"

"হুঁ! আচ্ছা, ওর ব্যাপারটা পরে দেখছি। এবারে সাধুবাবার কথা শুনি! উনি এখানে কতদিন এসেছেন?"

"বেশিদিন না, মাস ছয়েক। আমাদের এই শ্মশানে মাঝে-মাঝেই বাইরে থেকে এক-আধজন সাধু আসে, আবার চলে যায় দু' চারদিন পর। এই সাধুবাবা অনেকদিন রয়ে গেলেন। উনি একজন বড় তান্ত্রিক। লোকে এঁকে মানে।"

"তোমার বড়বাবুও কি এই সাধুবাবার কাছে যেতেন নাকি?"

"আজ্ঞে না। বড়বাবুর সাধু-সন্ন্যাসীতে তেমন বিশ্বাস ছিল না। আমাকে একদিন বলেছিলেন, মধু, ওই সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় তো, উনি ভূত দেখাতে পারেন কি না! তা হলে রাত্তিরের দিকে একদিন শ্মশানে যাব!"

"তুমি সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। সাধুবাবা হেসে বলেছিলেন, না, তোমার বাবুকে বোলো, আমি নিজেই কখনও ভূত দেখিনি!"

পরিতোষ ডাক্তার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর একবার খুব জোর বজ্রপাতের শব্দ হতেই তিনি ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলেন।

বাবা বললেন, "দ্যাখো দ্যাখো, বৃষ্টি বন্ধ হয় গেল। অদ্ভুত কাণ্ড!"

রমেন সরকার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বৃষ্টি হঠাৎ আরম্ভ হয়, হঠাৎ বন্ধ হয়, এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই। চলুন, এবারে সাধুবাবাকে দেখে আসা যাক।"

মধুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "দারোগাবাবুরা সেখানে কতক্ষণ আগে গেছেন ?"

মধু বলল, "তা এক ঘণ্টার ওপর তো হবেই।"

পরিতোষ ডাক্তার বাবাকে বললেন, "অরুণ, তুমি আমার কাঁধে ভর দাও, আস্তে-আস্তে হাঁটো। আমি এখনও বলছি, তুমি এখানে থেকে গেলেই পারতে।"

বাবা বললেন, "আমি ঠিক আছি !"

এত বৃষ্টির পর মাটি খানিকটা কাদা-প্যাচপেচে হয়ে গেছে, ওঁদের আস্তে-আস্তেই এগোতে হল।

শ্মশানের পাশে এসে ওঁরা ইরানি বা দারোগাবাবু কাউকেই দেখতে পেলেন না। শুধু একজন লম্বামতন লোক দাঁড়িয়ে আছে একটা কুঁড়েঘরের বাইরে।

বাবা বললেন, "কেউ নেই তো ! ওরা বোধহয় আবার এখান থেকে অন্য কোনও জায়গায় চলে গেছে !"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "সাধুবাবাটি গেলেন কোথায় ? তাঁর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে !"

লম্বা লোকটি রমেন সরকারকে দেখে দৌড়ে এসে একটা স্যালুট দিল।

রমেন সরকার অবাক হয়ে বললেন, "আপনি কে ? আপনিই এখানকার দারোগা নাকি ?"

"না, স্যার। আমার নাম খয়েরলাল। আপনি আমায় চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি পুলিশ সার্ভিসেই আছি !"

"খয়েরলাল ? নামটা শোনা-শোনা ! আগে তুমি ট্রেনে টেনে ইয়ে করতে, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।"

"তুমি এখানে কী করছ ? এই ভদ্রলোকের মেয়ে, তার নাম ইরানি, এখানকার দারোগার সঙ্গে সাধুবাবার কাছে এসেছিলেন, সে ব্যাপারে তুমি কিছু জানো ?"

"জানি স্যার। এখানে যা-সব কাণ্ড ঘটছে স্যার, দেখেশুনে একেবারে হাঁ হয়ে গেছি !"

"এবারে হাঁ-টি বন্ধ করো। এঁর মেয়ে কোথায়? সাধুবাবাটি কোথায়?"

"ওই ঘরের মধ্যে। কিন্তু ওখানে এখন যাবেন না স্যার। আওয়াজ হলে মুশকিল হয়ে যাবে। তাই তো আমি বাইরে পাহারা দিচ্ছি!"

"তার মানে?"

ইরানি ওই ঘরের মধ্যে আছে শুনেই বাবা আর পরিতোষ ডাক্তার সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, খয়েরলাল দৌড়ে গিয়ে তাঁদের বাধা দিয়ে বলল, "ওভাবে যাবেন না। দাঁড়ান, আগে সাধুবাবাকে ডাকি।"

খয়েরলাল পা থেকে জুতো খুলে পা টিপে-টিপে ঢুকে গেল কুঁড়েঘরের মধ্যে। তারপর সাধুবাবাকে ডেকে আনল বাইরে।

সাধুবাবা এসে তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নমস্কার।" তারপর বাবার মুখের দিকে চোখ রেখে বললেন, "আপনার মেয়ে ভাল আছে। চিন্তার কিছু নেই। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে।"

বাবা বললেন, "আমি এক্ষুনি তাকে দেখতে চাই।"

সাধুবাবা বললেন, "একটুখানি অপেক্ষা করুন, এখন ওর ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না।"

পরিতোষ ডাক্তার কড়া ভাবে বললেন, "ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না! তার মানে? এই অসময়ে সে ঘুমোবে কেন? কী হয়েছে সত্যি করে বলুন তো!"

সাধুবাবা বললেন, "বোঝানো সত্যিই মুশকিল। এক কাজ করুন তা হলে। সবাই জুতো খুলে আসুন, দেখবেন, যেন কোনও শব্দ না হয়।"

সেইভাবেই সবাই চলে এল কুঁড়েঘরটার ভেতরে। সেখানে সাধুবাবার কম্বলের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে ইরানি। চোখ বোঁজা, মুখে একটু-একটু হাসি। কী যেন মাঝে-মাঝে বলছে বিড়বিড় করে।

একবার সে বলে উঠল, "তুই সত্যি কথা বলছিস, দিপু? বানাচ্ছিস না তো?"

॥ ২৭ ॥

পরিতোষ ডাক্তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলে হাঁটু মুড়ে বসলেন ইরানির পাশে। বাবা কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত ভাবে বললেন, "কী হয়েছে ওর ? ইরানি, ইরানি !"

সঙ্গে সঙ্গে ইরানির বিড়বিড় করা থেমে গেল, হাসিটাও মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলল কয়েকবার। তারপর চোখ মেলে তাকাল।

পরিতোষ ডাক্তার ইরানির একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল রে, তোর ? অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি ? ইশ, জামা যে একেবারে জল-কাদায় মাখামাখি !"

ইরানি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখল। সাধুবাবার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সে বলল, "আমি দিপুকে দেখতে পেয়েছি। সে হারিয়ে যায়নি !"

সাধুবাবা বললেন, "তোমার সত্যি খুব মনের জোর আছে, মা। তোমার মতন মেয়ে আমি আগে দেখিনি !"

ইরানি বলল, "জ্যাঠামণিকেও দেখতে পেয়েছি। দিপু আর জ্যাঠামণি এক জায়গাতেই আছেন।"

বাবা বললেন, "দিপু ? কোথায় দেখতে পেলি তাকে ?"

ইরানি আস্তে আস্তে উঠে বসে বলল, "খুব কাছ থেকে দেখতে পেলুম, আমার সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা..."

হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক ভাবে চোখ বড়-বড় করে সে বলল, "বাবা ? তুমি কখন এলে ? কী করে এলে এখানে ? ওমা, ডাক্তার-কাকামণিও রয়েছেন। তাহলে এ জায়গাটা কোথায় ?"

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সব শোনা যাবে। তুই সুস্থ বোধ করছিস তো ? শরীর ঠিক আছে ?"

ইরানি বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে খুব। আমার জামা ভিজে গেল কী করে ? ও, মনে পড়েছে। আমি তো বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিপুকে

ডাকছিলুম।"

"দিপুর কী হয়েছিল ?"

"কাল রাত্তির থেকে দিপু যে হারিয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামণির মতন। তারপর সাধুবাবা বললেন, 'তুমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে একমনে দিপুর কথা চিন্তা করো আর ডাকো, তাকে দেখতে পাবে।' সত্যি সত্যি তাই হল !"

"কোথায় দেখতে পেলি দিপুকে ?"

"একটা আমবাগানে।"

রমেন সরকার আর দারোগাবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। এবারে দারোগাবাবু জোরে-জোরে বললেন, "স্যার, আমার মনে হচ্ছে এই সাধুবাবা একজন তান্ত্রিক। মেয়েটাকে হিপনোটাইজ করেছে। আমি স্যার, আগেই এই সাধুবাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, হঠাৎ খুব ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। এখানে স্যার ঝড়বৃষ্টিও খুব

রমেন সরকার বললেন, "দাঁড়ান, আগে দেখা যাক মেয়েটি সুস্থ আছে কিনা। ওর যদি চিকিৎসার দরকার হয়..."

পরিতোষ ডাক্তার বললেন, "না, তার দরকার নেই। এমনিতে তো ঠিকই আছে।"

রমেন সরকার বললেন, "তাহলে এখানে সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। রামবাবুর বাগানে গিয়েই বসা যাক। সাধুবাবা, আপনিও চলুন।"

সাধুবাবা বললেন, "আগে ওই মেয়েটির সব কথা শুনে নিন। সেটাই খুব দরকারি। একটু পরে ও সব কথা ভুলে যাবে।"

ইরানি আচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ ?"

সাধুবাবা বললেন,"না, মা, তুমি স্বপ্ন দেখোনি, যা দেখছ, সব সত্যি। এবারে বলো তো, কী কী দেখলে ?"

ইরানি বলল, "দিপুকে দেখলুম, একটা আমবাগানে শুয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই দিপু, তুই আমাকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলি ? তুই এখানে শুয়ে আছিস কেন ?' দিপু বলল, 'এটা খুব মজার জায়গা রে দিদি। এখানে শুয়ে থেকেও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো

যায় । এর মধ্যে কত জায়গায় যে গেলুম !' দিপুটা তো খুব বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে, তাই আমার বিশ্বাস হল না । আমি বললুম, 'ফের তুই গুল ঝাড়ছিস, দিপু ? এক জায়গায় শুয়ে কি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যায় ? তুই কোথায় কোথায় ঘুরেছিস ?' দিপু বলল, 'সে কত জায়গা ! এই তো এইমাত্র দেখলুম, তুই নদীর ধারে এক সাধুবাবার আশ্রমের সামনে বৃষ্টিতে ভিজছিস । আমি তোর পাশে দাঁড়ালুম !' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আমি যে সাধুবাবার কাছে এসেছি, তা তুই জানলি কী করে ?' দিপু বলল, 'সে একটা বেশ মজার উপায় আছে ! জানিস দিদি, আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজে পেয়েছি । তুই দেখবি জ্যাঠামশাইকে ? ওই দ্যাখ ।' আমি দেখলুম, জ্যাঠামশাইও শুয়ে আছেন এক জায়গায়...তারপর আর মনে নেই !"

কথা থামিয়ে ইরানি বলল, "চলো, আমরাও সেই আমবাগানে যাই !"

রমেন সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় সেই আমবাগান ?"

ইরানি বলল, "তা তো জানি না !"

রমেন সরকার সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসব কী ? আপনি সত্যি মেয়েটাকে হিপনোটাইজ করেছিলেন ?"

সাধুবাবা বললেন, "সে শক্তি আমার নেই । এ মেয়েটির অসাধারণ মনের জোর, তাতেই সে দূরের জিনিস দেখতে পেয়েছে ।"

রমেন সরকার বললেন, "আমি এ-কথার মানে বুঝতে পারছি না ।"

খয়েরলাল এগিয়ে এস বলল, "স্যার, এই সাধুবাবা যে-সে লোক নন ! এনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে । ইনি আমাকে দেখে ঠিক চিনে ফেলেছেন !"

"কী চিনে ফেলেছেন ?"

"মানে, ইয়ে, আমার গায়ে তো পুলিশের পোশাক নেই, তবু ইনি ঠিক বলে দিলেন যে আমি পুলিশে কাজ করি !"

সাধুবাবা বললেন, "না, আমি সে-কথা বলিনি । আমি বলেছিলুম, তুমি আগে ট্রেনে ডাকাতি করতে, এখন ভাল হয়ে গেছ !"

সাধুবাবা রমেন সরকারের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি তো পুলিশের একজন বড় কেউ, তাই না ? শুনুন, এখানে যে ব্যাপারটা ঘটছে কয়েকদিন

ধরে, তার সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে কেউ কারুর কোনও ক্ষতি করছে না।"

রমেন সরকার বললেন, "কেউ কোনও ক্ষতি করছে না মানে ? রামবাবু হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলেন। তাঁর পেয়ারাবাগান কেউ পুড়িয়ে দিল। তারপর দিপু নামে ছেলেটি, তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

সাধুবাবা বললেন, "পেয়ারাগাছটি পুড়ে গেছে বাজ পড়ে। আর রামবাবু কিংবা এই মেয়েটির ভাই, তাদের কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি, তারা নিজের ইচ্ছেতে গেছে।"

"কোথায় ?"

"তা আমি ঠিক জানতুম না। জানলে তো আগেই বলে দিতুম। একটু-একটু আন্দাজ করেছিলুম শুধু। এই মেয়েটির কথা শুনে আমি সব বুঝতে পারলুম।"

"কিন্তু আমরা তো এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সব আপনাদের বুঝিয়ে বলা যাবে না। অত সময় নেই। সংক্ষেপে বলছি শুনুন। আমার এক গুরুভাই ছিল, তার নাম ডমরুপাণি নন্দী। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে !"

"তার মানে ? কোথাও চলে গেছে ?"

"না, আমি যা বলছি তাই। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের চেনাশুনো জগতের বাইরে একটা জগৎ আছে। সেখানে কেউ-কেউ অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক যেন একটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ার মতন। ডমরু শখ করে সেই অদৃশ্য জগতে গেছে। কিন্তু আর ফিরে আসতে পারছে না। মাঝে-মাঝে সে আমার কাছে আসবার চেষ্টা করে। সে ভাবে, আমি বুঝি তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে এখানে আসবার চেষ্টা করলেই প্রকৃতির মধ্যে সাংঘাতিক একটা ওলট-পালট হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি নামে, বাজ পড়ে !"

পরিতোষ ডাক্তার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "শুনুন মশাই, আপনাকে আমি অসম্মান করছি না। কিন্তু আমি শুনেছি, সাধু-সন্ন্যাসীরা সব সময় গাঁজায় দম দিয়ে থাকেন। আপনিও কি নেশার ঝোঁকে আছেন ? এসব কী বলছেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনও মানুষ আবার অদৃশ্য

হতে পারে নাকি ?"

সাধুবাবা বললেন, "আপনারা অবিশ্বাস করলে আমার আর কিছু বলার নেই।"

বাবা বললেন, "না, না, আপনি সবটা বলুন। পরিতোষ, ওঁকে সব খুলে বলতে দাও!"

রমেন সরকার বললেন, "সাধুবাবা, আপনি আগে বলুন, আপনার এই গল্পের সঙ্গে রামবাবু আর দিপুর নিখোঁজ হয়ে যাবার কী সম্পর্ক!"

সাধুবাবা বললেন, "ওই যে আমার গুরুভাইয়ের কথা বললাম, সে তো সর্বক্ষণ চেষ্টা করছে ফিরে আসতে। তার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না বলে সে মাঝে-মাঝে কোনও-কোনও মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ে।"

"বুঝলুম না। আমি স্বপ্ন দেখছি, তার মধ্যে কেউ ঢুকে পড়বে কী করে?"

"মনে করুন, আপনি স্বপ্ন দেখছেন যে, আপনি একা-একা কোনও জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই দেখলেন, একটু দূরে একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আপনি তার কাছে গেলেন। তার সঙ্গে কথা বলে আপনার ভাল লাগল। তারপর আপনি তার সঙ্গেই রইলেন। এই রকম ব্যাপার আর কি!"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, দিপু আর তার জ্যাঠামশাই আপনার ওই অদৃশ্য গুরুভাইয়ের কাছেই রয়েছে। ওরা দু'জনও কি অদৃশ্য হয়ে গেছে?"

"সবাই কি আর অদৃশ্য হতে পারে? হতে তো অনেকেই চায় মাঝে-মাঝে। আপনি চান না? ফিরে আসবার উপায় জানলে সবাই চাইত। না, দিপু আর তার জ্যাঠা অদৃশ্য হয়নি। ঘুমের ঘোরে মানুষ হেঁটে-হেঁটে অনেক দূরে চলে যায় কখনও কখনও। ওরা দু'জনেই সেইভাবেই গেছে!"

হঠাৎ ইরানি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ওই আমবাগানে যাব। দিপু আমায় ডাকছে!"

বলতে বলতেই ইরানি ঘর থেকে বেরিয়ে একটা দৌড় লাগাল। বাকি সবাই ছুটল তার পেছন-পেছন।

॥ ২৮ ॥

দিপু ইরানির সঙ্গে কথা বলছিল, হঠাৎ চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল, ইরানিকে আর সে দেখতে পেল না। অথচ দিপুর মনে হল, ইরানি তার কাছেই আছে, মাঝখানে কিছু একটা আড়াল পড়ে গেছে। দিপু হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তার হাতে কিছুই ঠেকল না। এক্ষুনি দিনের আলো ঝলমল করছিল, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কী করে?

দিপু ডাকল, "দিদি, এই দিদি!"

কোনও উত্তর এল না। তা হলে কি ইরানি তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। দিপু ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "কী হল? এই জায়গাটা অন্ধকার করে দিল কে?"

অমনি দুলতে লাগল অন্ধকারটা। জলের ঝাপটার মতন কেউ যেন সেখানে আলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তারপর সেই অন্ধকারটা একটা পর্দার মতন হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে চলে গেল।

এবারে দিপু দেখতে পেল একটু দূরে ডমরুজি একটা ছোট আমগাছের গায়ে হাত বুলোচ্ছেন। আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন।

দিপু গলা তুলে বললেন, "এই যে, শুনছেন! ডমরুজি, আমি দিদির সঙ্গে কথা বলছিলুম, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কী করে?"

ডমরুজি মুখ ফিরিয়ে দিপুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর কী যেন বললেন, দিপু কিছুই শুনতে পেল না। ডমরুজির মুখ নড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "কী বলছেন?"

অমনি ডমরুজি অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেখান থেকে। হাওয়ায় গাছটা দুলতে লাগল, ঠিক যেন মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে চাইছে। তারপর আস্তে-আস্তে গাছটাই হয়ে গেল ডমরুজি। তিনি একটা সবুজ আলখাল্লা পরে আছেন, তাঁর মাথার দু'পাশ দিয়ে ডালপালা বেরিয়ে এসেছে। সেই অবস্থায় ডমরুজি এগিয়ে আসতে লাগলেন তার দিকে।

দিপু বলল, "এ কী, আপনি এরকম অদ্ভুতভাবে সেজেছেন কেন?"

ডমরুজি বললেন, "আমি তো কিছু সাজিনি, তুমিই আমাকে

সাজিয়েছ।"

"তার মানে?"

"তোমার ঘুম ভাল করে ভাঙেনি, তুমি এখনও স্বপ্ন দেখছ!"

"আমি যে দিদির সঙ্গে কথা বলছিলুম?"

"তুমি তোমার দিদি ইরানির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে। সেই স্বপ্নের মধ্যে দু'জনে কথা বলছিলে। কিন্তু ইরানির যে ঘুম ভেঙে গেল। এখন তো আর তুমি ওকে দেখতে পাবে না।"

"মনে হচ্ছিল দিদি যেন একদম আমার সামনে বসে আছে।"

"আসলে তোমার দিদি শুয়ে আছে শ্মশানের ধারে এক সাধুর ঘরের মধ্যে।"

"আমি সেখানে যেতে পারি না? দিদির খুব মনখারাপ।"

ডমরুজি মুখ নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মুখখানা হালকা নীল রঙের. হয়ে গেল। দিপু আগেও লক্ষ করেছে, ডমরুজির মন-খারাপ হলেই মুখের রং বাদলে যায়।

ডমরুজি আস্তে-আস্তে বললেন, "হ্যাঁ, এবার তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত। তোমার বাবা তোমাকে খুঁজতে এসেছেন। শোনো দিপু, তুমি কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই এখানে এসেছিলে, আমি তোমাকে জোর করে আনিনি।"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, আমি তো ইচ্ছে করেই এসেছি। কিন্তু—"

"এবার তোমাকে ফিরতে হবে। আমি সে ব্যবস্থা এক্ষুনি করে দিতে পারি। তবে, তুমি কি একা ফিরতে চাও, না তোমার জ্যাঠামশাইকেও সঙ্গে নেবে?"

"জ্যাঠামশাইকে তো নিতেই হবে। তাঁকে খুঁজতেই তো এসেছি!"

"তোমার পক্ষে ফেরা সোজা! কিন্তু তোমার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে একটু মুশকিল হবে। উনি যে ফিরতে চান না। তুমি ওঁকে বোঝাতে পারবে?"

"হ্যাঁ পারব। জ্যাঠামশাই কোথায়?"

"আমি তোমার স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছি। এবারে তুমি তোমার জ্যাঠামশাইকে খুঁজে নাও। আমি তোমার পাশে থাকব না, তা হলে অসুবিধে হবে।

তোমরা ফিরে যাবে, আমার আর কোনওদিন ফেরা হবে কি না কে জানে ! বিদায় দিপু !"

তারপরই ডমরুজির চেহারাটা মিলিয়ে গেল, একটু দূরে দেখা গেল ছোট আমগাছটাকে, সেটা আবার বাতাসে দুলছে।

মাথার ওপরে একটা প্লেনের শব্দ শোনা গেল।

এবারে দিপু বুঝতে পারল, সত্যিই সে জেগে উঠেছে। সে শুয়ে আছে আমবাগানে। গায়ে খুব চড়া রোদ লাগছে। কাছে, দূরে অনেক রকম শব্দ। স্বপ্নের মধ্যে এত শব্দ শোনা যায় না। সব কিছুই নরম-নরম মনে হয়।

দিপুর দারুণ খিদে পেয়ে গেল। ডমরুজির সঙ্গে সে কতদিন ধরে ঘুরছে কে জানে ! এর মধ্যে তো সে কিছুই খায়নি।

খিদের চোটেই দিপু উঠে পড়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। এই আমবাগানটা আগে সে ভাল করে লক্ষই করেনি। মাঝে-মাঝে স্বপ্ন ভেঙে অস্পষ্ট একটু দেখেছে। এখন সে দেখতে পেল যে, বাগানটা বেশ অনেকখানি বড়, একদিকে একটা ভাঙা বাড়ি। তার পাশে একটা পুকুর। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় এ বাড়িতে কোনও মানুষজন থাকে না।

দু'-একটা কাঁচা আম পড়ে আছে মাটিতে। দিপু সেগুলোই কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগল। দারুণ টক।

জ্যাঠামশাই গেলেন কোথায় ? ডমরুজি বলে গেলেন জ্যাঠামশাইকে খুঁজে নিতে। স্বপ্নের মধ্যে জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাওয়া খুব সহজ ছিল। এখন দিপুকে খুঁজতে হবে। আচ্ছা, জ্যাঠামশাই তো এখানে আরও আগে থেকে রয়েছেন, তাঁর খিদে পায় না ?

খুঁজতে খুঁজতে দিপু দেখল, পুকুরের ধারে একটা ছোট ঘর। আগেকার দিনে বোধহয় সেটা স্নান করে উঠে জামা-কাপড় ছাড়ার ঘর ছিল। সেই ঘরের মেঝেতে একটা খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন জ্যাঠামশাই। তাঁর মুখে ছ'সাত দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, তিনি চোখ বুজে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসি।

দিপু আগে জ্যাঠামশাইকে যখন দেখেছে তখন তাঁর মুখে দাড়ি ছিল না। স্বপ্নে তা হলে চেহারাটাও বদলে যায় ?

সে আস্তে গায়ে হাত রেখে ডাকল, "জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই !"

দু'তিনবার ডাকেও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন দিপু বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিল।

জ্যাঠামশাই এবারে বিরক্ত ভাবে চোখ মেলে বললেন, "কে ? এই, তুই কে রে ? ও, কেষ্ট, তাই না ? আমার ঘুম ভাঙালি কেন রে ?"

দিপু বলল, "আমি কেষ্ট নই। জ্যাঠামশাই, আমি দিপু !"

জ্যাঠামশাই চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখলেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, "দিপু ? তুই এখানে এলি কী করে ? এখানকার সন্ধান তো কেউ জানে না ?"

"জ্যাঠামশাই, একটু আগেই তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, মনে নেই ? সেই যে একটা নদীর ধারে—"

"ইস, তুই আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলি ? কী চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলুম জানিস ? কাকে দেখছিলুম বল তো ? ইরানিকে ! আমি ইরানির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম ! খুব সুবিধে হয়েছিল, আমি ওকে আমার খবর সব বলে দিচ্ছিলুম, ও তোর বাবাকে জানিয়ে দিত !"

"আমার সঙ্গেও দিদির দেখা হয়েছিল। আমি দিদিকে বলে দিয়েছি, আমরা এই আমবাগানে আছি ! চলুন জ্যাঠামশাই, সময় হয়ে গেছে, আমাদের এবারে ফিরে যেতে হবে।"

"অ্যাঁ ? তুই বলিস কী ? ফিরে যাব ? কোন্ দুঃখে ? এখানে চমৎকার আছি। কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই, শুধু শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখা। কত সুন্দর জিনিস যে দেখলুম !"

"জ্যাঠামশাই, জানেন কি, বাবা পর্যন্ত আমাদের খোঁজে এখানে চলে এসেছেন। আপনি এখানে কতদিন শুয়ে থাকবেন ?"

"তুই এক কাজ কর, দিপু ! তুই চলে যা ! তোর পড়াশুনো আছে, তোর মা চিন্তা করবে, তুই এখানে বসে আছিস কেন ? যা, দৌড়ে চলে যা ! কী করে যাবি জানিস তো ? এই আমবাগানটা পার হলেই দেখবি একটা খাল। সেই খালের ধার দিয়ে সোজা হেঁটে যাবি। তারপর এক সময়ে দেখবি সেই খালটা একটা নদীতে মিশেছে। তখন নদীর ডানপাশ ধরে আর খানিকটা গেলেই শ্মশান দেখতে পাবি। সেখান থেকে আমার

বাগান তো কাছেই !"

"জ্যাঠামশাই, আপনাকে না নিয়ে আমি যাব না !"

"দূর পাগল, আমার সঙ্গে তোর ফেরার কী সম্পর্ক ! তুই তো আমাকে দেখেই গেলি, ফিরে গিয়ে সবাইকে বলবি, আমি ভাল আছি !"

"না, আপনি চলুন !"

দিপু জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরতেই তিনি বেশ রেগে গেলেন। চোখ কটমট করে বললেন, "ওরকম অসভ্যতা করে না দিপু ! হাত ছাড় ! আমি যাব না, তুই ফিরে যা বলছি !"

দিপু বলল, "আমি তো এই আমবাগানটা চিনে গেলাম। এখানে যদি বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "এলেও আর আমাকে খুঁজে পাবি না। এখন বিরক্ত করিস না তো। আমাকে একটু ঘুমোতে দে।"

"জ্যাঠামশাই, আপনার খিদে পায় না ?"

"চুপ, এখানে খিদের কথা উচ্চারণ করতে নেই।"

জ্যাঠামশাই আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজে গেল।

দিপু বুঝতে পারল না সে এখন কী করবে। ইরানির সঙ্গে স্বপ্নে দেখা হয়ে যাবার পর তার মনটা খারাপ লাগছে। এখানে আর একটুও থাকতে ভাল লাগছে না। কিন্তু জ্যাঠামশাই এরকম জেদ করলে তো মুশকিল। সে তো আর জ্যাঠামশাইকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারে না।

ডমরুজির সঙ্গে আর একবার দেখা হলে ভাল হত। কিন্তু ডমরুজি যে বললেন 'বিদায় দিপু', তার মানে ওঁর সঙ্গে কি আর দেখা হবে না ? উনি নিজে ইচ্ছে না করলে তো ওঁর সঙ্গে দেখা করার কোনও উপায় নেই !

জ্যাঠামশাই এর মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন। যেন কোনও ব্যাথায় উঃ করছেন। এখন তাঁর ঠোঁটে হাসি নেই। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, "না, ডমরুনাথ, আমি যাব না। তুমি কেন আমায় ভয় দেখাচ্ছ ? আমি পারব, সহ্য করতে পারব। উঃ, উঃ !"

জ্যাঠামশাই চোখ মেলে দিপুর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে একটা ভয়ের ছাপ। এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর তিনি বললেন, "ও, দিপু, তুই কি সর্বনাশ করলি আমার! তুই খিদের কথা বললি। আর

আমি অমনি শুধু খিদের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। চতুর্দিকে কত মানুষ খেতে পাচ্ছে না! ডমরুনাথকে ডেকে বললুম, আমাকে অন্য স্বপ্ন দাও! সে বলল, 'তোমাকে ফিরে যেতে হবে। নইলে এখন থেকে এই স্বপ্নই দেখবে।' সব স্বপ্নই তো সুন্দর নয়! ওরে দিপু, খিদেয় যে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

দিপু বলল, "কাঁচা আম খাবেন?"

"কাঁচা আম? তাতে যে আমার দাঁত টকে যাবে। তবু দে, তাই দে! থাকতে পারছি না।"

"তা হলে এ ঘর থেকে বেরিয়ে চলুন। বাগানে আম আছে।"

জ্যাঠামশাই প্রায় দৌড়েই চলে এলেন বাগানে। নিজেই একটা আম কুড়িয়ে নিয়ে কামড় বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "উ হু হু হু, বড্ড টক। বুড়োমানুষে এ জিনিস খেতে পারে?"

দিপু বলল, "তা হলে?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "তা হলে আর কী হবে? চল্, তাহলে ফিরেই যাই। আর খিদে সহ্য করতে পারছি না। গরম ভাত খেতে ইচ্ছে করছে, আর একটু ঘি আর আলুসেদ্ধ। তোর ইচ্ছে করছে না?"

দিপু বলল, "খুব!"

জ্যাঠামশাই দিপুর হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। আমবাগানটা পার হয়ে আসার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার স্বপ্ন কি একেবারেই ভেঙে গেল, আর ডমরুনাথকে দেখতে পাব না?"

দিপু বলল, "রোজ রাত্তিরে ঘুমিয়েই তো আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন ওঁকে দেখতে পাব না?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না রে! সে স্বপ্ন তো আলাদা। ডমরুনাথ আমাকে আর তোকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে এসেছিল। কষ্ট হচ্ছে রে যেতে, এদিকে খিদের কষ্টও সহ্য হচ্ছে না।"

দিপু দেখল, কাছেই একটা আমগাছের ডগা খুব বেশি নড়ছে। অন্য গাছগুলো শান্ত। ওই গাছটা ওরকম করছে কেন, ওখানে কি ডমরুজি আছেন? কী জানি!

ওরা খালপাড় ধরে হাঁটতে লাগল জোরে জোরে। খিদের টানই ওদের

টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদে দূরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কয়েকজন লোক ছুটে আসছে। সবার আগে দেখা গেল ইরানিকে।

কী করে ইরানি এই রাস্তাটা চিনতে পারল ?

সে কথা চিন্তা করার আর সময় হল না, দূর থেকেই ইরানি ডেকে উঠল, "দিপু— ।" সেও উত্তর দিল, "দিদি, আমরা এসে পড়েছি !"

দিপুর বুকটা ধকধক করছে। হঠাৎ সাংঘাতিক একটা উত্তেজনা বোধ করছে সে। আকাশে ঘনিয়ে এসেছে মেঘ। জোর হাওয়া উঠল, বজ্রপাতের শব্দ হল। তার মানে ডমরুজি কাছেই আছেন। তিনি নামবার চেষ্টা করছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন ওদের সবাইকে।

দিপু আকাশের দিকে তাকাল। সে ডমরুজিকে দেখতে পেল না।

আর কোনওদিনই দেখতে পাবে না ?